তোমাকে ভালবাসি হে নবী!

গুরুদত্ত সিং

তোমাকে ভালবাসি হে নবী

অনুবাদ

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ
(শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, আশরাফাবাদ)

মূল

গুরুদত্ত সিং
বার, এট ল' এডভোকেট, (লাহোর হাইকোর্ট),
সম্পাদক, 'ইন্ডিয়া', লন্ডন

প্রকাশনায়
দারুল কলম
আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০
ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

তোমাকে ভালবাসি হে নবী

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

মূল ঃ গুরুদত্ত সিং

প্রকাশক–
দারুল কলম
আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা – ১৩১০

প্রথম প্রকাশ–
জুলাই, ১৯৯৮ ঈসাঈ

দ্বিতীয় প্রকাশ–
রাবিঃ ছানী, ১৪২৩ হিজরী
জুলাই, ২০০২ ঈসাঈ

পঞ্চম প্রকাশ–
রাবিঃ ছানী, ১৪২৮ হিজরী
মে, ২০০৭ ঈসাঈ

প্রচ্ছদ ঃ বশির মিছবাহ

অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা
হাসান মিছবাহ

কম্পিউটার কম্পোজ–
দারুল কলম কম্পিউটার
আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০
ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

হাদিয়া ঃ ৭০/০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

উৎসর্গ

আমাদেরকে যিনি 'রাসূলে আরাবী'

উপহার দিয়েছেন, আল্লাহ যেন তার

প্রতি দয়ার আচরণ করেন।

অমুসলিম হয়েও আল্লাহর রাসূলকে

যারা ভক্তি করেন,

ভালোবাসেন তাদেরকে যেন

আল্লাহ বিশ্বাসের সম্পদ দান করেন।

–অনুবাদক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ সীরাতগ্রন্থ প্রণেতা জ্ঞানতাপস আল্লামা

সৈয়দ সোলায়মান নদভী (রহঃ)-এর

মন্তব্য

'রাসূলে আরাবী' গ্রন্থের লেখক জনাব গুরুদত্ত সিং দারা, বি, এল - বার এট ল' (লাহোর) একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। লণ্ডনে অবস্থানকালে তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ এবং উঠা-বসার বারবার সুযোগ হয়েছে এবং তার অসাম্প্রদায়িক চিন্তা ও তাওহীদমুখী চেতনার পরিচয় পেয়ে আমার হৃদয় পুলকিত হয়েছে এবং এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে যে, ভারতবর্ষের জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মাঝে এ ধরনের মানবতাবাদী ও মানব প্রেমিক কিছু মানুষ যদি আত্মপ্রকাশ করে তাহলে 'ভারত-সন্তানদের' মাঝে প্রীতি ও সম্প্রীতির যে অটুট বন্ধন সৃষ্টি হবে, বাইরের কোন শত্রু তা ছিন্ন করতে পারবে না।

দারা সাহেব অত্যন্ত উদার মন নিয়ে ইসলামের নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন। তার লেখার হরফে হরফে প্রেম ও ভালোবাসার 'আবে কাউছার' যেন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, লেখকের কলম কেমন আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্রোতে 'প্রবাহিত' হয়ে চলেছে! আমি বইটি আগাগোড়া পড়েছি এবং একটি প্রেম-উদ্বেলিত গতিময় ভাষার রচনা হিসাবে বইটি আমার পছন্দ হয়েছে।

ইতিহাসের মানদণ্ডে এর চেয়ে উচ্চস্তরের গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব ছিলো, তবে এটা অসম্ভব যে, কোন অমুসলিম লেখক ভক্তি-ভালবাসার, এর চেয়ে সুন্দর কোন উপঢৌকন দরবারে নববীতে পেশ করতে পারবেন। আর এটাই আলোচ্য গ্রন্থের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

শব্দচয়ন এবং বক্তব্য উপস্থাপনের ধরনে যদি কোন ত্রুটি নজরে পড়ে তাহলে বিষয় ও মর্মকে বিবেচনায় রেখে লেখকের আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে।

দু'আ করি আল্লাহ তাআলা যেন রহমাতুল-লিল আলামীনের ওছীলায় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মাঝে একতা ও সখ্যতার চেতনা জাগ্রত করে দেন এবং একে অপরের 'ধর্ম-নেতাদের' প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মনোভাব দান করেন ।

সৈয়দ সোলায়মান নদভী

মুসলিম ডেলিগেশন, লন্ডন

অনুবাদকের কথা

'সীরাতুন্নবী' – হৃদয়ের নিভৃতলোকে আশ্চর্য স্নিগ্ধ এক অনুভূতি জাগ্রত করে ছোট্ট এ শব্দটি। জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞান এবং পথ ও পাথেয় লাভের 'আলোক-উৎস' হলো সীরাতুন্নবী। তাই – আল্লাহর শোকর – জীবনের শুরু থেকে 'সীরাতুন্নবী' ছিলো আমার অধ্যয়নের অন্যতম প্রিয় বিষয়। নানাজান মাওলানা আব্দুল জলীল মাযাহেরী (রহ) রচিত 'ছোটদের নূরনবী' দ্বারা আমার সীরাত অধ্যয়নের শুভ সূচনা। তখন থেকে এখন– এ দীর্ঘ জীবন, বাংলা, উর্দূ ও আরবী ভাষার সীরাতভাণ্ডার থেকে আমি যথাসম্ভব 'আলো' অর্জনের চেষ্টা করে আসছি। তবে তা সীমাবদ্ধ ছিলো মুসলিম মনীষীদের কলম পর্যন্ত। কোন অমুসলিম মনীষীর লেখা সীরাতগ্রন্থ পড়ার সুযোগ আমার কেন যেন কখনো হয়নি।

কয়েক বছর আগে নূরিয়া মাদরাসার কুতুবখানায় 'রাসূলে আরাবী' নামে উর্দূ ভাষায় রচিত ছোট্ট কলেবরের একটি কিতাব দেখতে পেলাম এবং আগ্রহভরে হাতে নিলাম, লেখকের নাম গুরুদত্ত সিং! প্রথম পৃষ্ঠায় পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে– 'ইসলামের নবীর প্রতি অনুরাগী একজন শিখ গুরুদত্ত সিং-এর কলমে রচিত'।

কৌতুহলী মনে পাতা উল্টে দেখি, আমার জন্য অপেক্ষা করছে আরেকটি বিস্ময়! জগদ্‌বরেণ্য আলিম ও সীরাত গবেষকআল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী (রহ) বইটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ প্রশংসা-মন্তব্য লিখেছেন । ফলে আমার হৃদয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে একটি 'কোমল অনুভূতি' সৃষ্টি হলো। কিতাবটি পড়লাম, একবার, দু'বার এবং কয়েকবার। এক কথায় 'অপূর্ব'! যেমন ভক্তি ভালোবাসার আবেগ-উচ্ছ্বাস, তেমনি ভাষা ও সাহিত্যের ছন্দময় প্রকাশ! হৃদয়ের উৎস থেকে নবী-প্রেমের একটি ঝর্ণাধারা যেন কল্লোল ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে। ভাবের তরঙ্গে, আবেগের উচ্ছ্বাসে, শব্দের সুরঝংকারে এবং ভাষার নৃত্যছন্দে আমিও যেন দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। আমারও হৃদয়ে নতুন করে নবীপ্রেম উথলে উঠেছে। যতবার পড়েছি ততবার আমি 'দুই নয়নের জলে' সিক্ত হয়েছি এবং লজ্জিত মনে বারবার ভেবেছি, 'পর' যদি

আমাদের নবীকে এমন করে ভালোবাসতে পারে, এমনভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধার 'অর্ঘ্য' নিবেদন করতে পারে তাহলে 'আপন' যারা, তাদের কেমন হওয়ার কথা ছিলো, অথচ তারা কেমন হয়েছে!

একদিন এক ঘরোয়া 'সাহিত্য জলসায়' এক বন্ধু বললেন, বইটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে বাংলাদেশের কোটি কোটি 'ভক্ত' ও কতিপয় 'বিরক্ত'– উভয় শ্রেণীর পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারলে ভালো হয়। তাতে কোটি কোটি নবীভক্ত পাঠক নবীপ্রেমের একটি নতুন সৌন্দর্যে অবগাহন করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হবেন। আর রহমতের নবীর প্রতি কতিপয় 'বিরক্ত' যারা, তাদের মন-মগজের সব জঞ্জাল একজন অমুসলিমের হৃদয় থেকে উৎসারিত নবীপ্রেমের স্রোতধারায় ভেসে যাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছা হলে তারা পরিশুদ্ধ হওয়ারও সুযোগ পাবে।

কথাটি আমার মনে দাগ কাটলো এবং আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের উপর ভরসা করে একসময় আমি বইটির অনুবাদ শুরু করলাম। ধারণা ছিলো, বইটির অনুবাদ খুব সহজ হবে না। বাস্তবে দেখা গেলো, কাজটি আমার ধারণার চেয়েও কঠিন। কেননা লেখকের ভাব ও আবেগের উচ্ছ্বাস এত প্রবল, ভাষা ও বক্তব্যের গতি এত উচ্ছল এবং উপমা ও শব্দ প্রয়োগের কুশলতা এত চমৎকার যে, আমার হাতের দুর্বল কলমের পক্ষে সেই 'বেগ ও আবেগ' এবং সেই 'গতি ও ছন্দের' ভাষান্তর মনে হয়েছে প্রায় অসম্ভব। তদুপরি একজন অমুসলিমের চিন্তা-চেতনা, ভাব ও ভাবনা এবং ভক্তি-ভালোবাসার নিজস্ব প্রকাশ 'অক্ষত' রাখাও বেশ কঠিন, অথচ 'সাহিত্য-সততার' জন্য তা অতীব জরুরী। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, সাধ্যের সীমানায় আমি চেষ্টা করেছি এবং আল্লাহর রহমতে হয়ত কিঞ্চিৎ সফলতাও এসেছে। যে উদ্দেশ্যে বইটি অনুবাদ করা, তা যদি কিছুমাত্র অর্জিত হয়, সর্বোপরি আল্লাহ মেহেরবান যদি কবুল করেন তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আমার কামনা, এ লেখা যেন রোয হাশরে আমাকে 'আলো' দান করে এবং হাউযে কাউছারের পথ চিনিয়ে দেয়।

বইটি সম্পর্কে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী (রহঃ)-এর মত ব্যক্তিত্বের একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সৈয়দ ছাহেবের মনে হয়েছে, লেখকের কলমের প্রতিটি শব্দ থেকে নবীপ্রেমের 'আবে কাউছার' যেন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। 'আবে কাউছারের' সেই 'বিন্দুপতন'-এর যে স্বাদ ও সৌন্দর্য এবং যে সুর মাধুর্য, বাংলা অনুবাদে সেটাই আমি ধরে

রাখার চেষ্টা করেছি এবং এই ধরে রাখার প্রয়োজনে অনিবার্য কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি। উর্দূ-ফারসী কবিতাগুলো বক্তব্যের গতিময়তা অব্যাহত রাখার জন্য বাদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া উচ্ছ্বাস-প্রবলতায় বক্তব্যের বিন্যাস-কাঠামো মাঝে মধ্যেই কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে বিন্যাস-কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কারও আমাকে করতে হয়েছে, তবে লেখকের বক্তব্য এবং ভাব ও আবেগ অক্ষুণ্ন রাখার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যারা উর্দূ জানেন তাদের বোঝার সুবিধার জন্য লেখকের ভূমিকার অংশবিশেষ নমুনারূপে তুলে দেয়া হলো। মূল ও অনুবাদ মিলিয়ে দেখলেই বিষয়টি তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দীর্ঘ দিন অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়েছিলো এবং আটাশির প্রলয়ংকরী বন্যায় ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমার স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা সাখাওয়াত তাদের প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল কাউছার' থেকে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ১৯৯৮-এ তা আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে। সে জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সকলকে খায়রুল জাযা দান করুন। দীর্ঘ দিন 'বইমহলে' বইটি অনুপস্থিত ছিলো এবং পাঠকমহল থেকে জোর তাগাদা অব্যাহত ছিলো, তাই প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও 'সোভাবর্ধনের' পর 'দারুল কলম' থেকে এখন এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সংস্করণের মত এবারও প্রচ্ছদশিল্পী আমার প্রিয় ভাই মাওলানা বশির মিছবাহ। তার আঁকা প্রচ্ছদের সাজে আমার কোন বই যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন আমি তৃপ্তিবোধ করি। আল্লাহ তার 'নেক আরজু' পূর্ণ করুন।

দ্বিতীয় সংস্করণের অক্ষরবিন্যাস ও সার্বিক অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রম দিয়েছে আমার স্নেহের ভাই মাওলানা হাসান মিছবাহ। এ বিষয়ে তার গতি ও দ্রুততা প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আটাশির বন্যায় অনুবাদের পাণ্ডুলিপি রক্ষা পেলেও মূল বইটি সেই যে হারিয়ে গেলো, আর পাওয়া গেলো না। ফলে প্রথম সংস্করণে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী (রহঃ)-এর মন্তব্য সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অনেক পরে আমার প্রিয়তম ছাত্রদের একজন মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী-এর মাধ্যমে জানতে পারি যে, বইটির একটি দুর্লভ কপি

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লৌখনো-এর কতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বইটির ফটোকপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাকে সর্বোচ্চ জাযা দান করুন। তার ও 'তাদের' সম্পর্কে আমি যে স্বপ্ন দেখি, আল্লাহ তা বাস্তব করুন। জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যে সাধনা ও 'সাহারুল-লায়ালি'[১] -এর প্রয়োজন, আল্লাহ আমাকে এবং তাদেরকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রিয় পাঠক! অনেক বিরক্ত করা হলো, এবার আমি যাই। আপনি প্রবেশ করুন 'সীরাত-উদ্যানের' একটি নতুন অঙ্গনে, নবী প্রেমে 'স্নাত' একজন 'অমুসলিম' তার হৃদয়ের সুরভি মেখে যেখানে সৃষ্টি করেছেন একটি অনবদ্য ফুল, যার নাম 'তোমাকে ভালোবাসি হে নবী'!

আমার শুধু একটি প্রশ্ন– একজন 'অমুসলিম' নবী প্রেমের এমন সুরভিত 'পুষ্প' কীভাবে প্রস্ফুটিত করতে পারেন! আর যিনি পারেন তিনি কীকরে অমুসলিম থাকেন! নাকি 'বিদায় গ্রহণের' পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? তাই যেন হয়!

প্রিয় পাঠক! আরেকটি কথা না বলে পারি না। 'তোমাকে ভালোবাসি হে নবী' এর প্রথম পাঠক ছিলেন আমার আম্মা-আব্বা। মাথার উপর এখনো আল্লাহ আম্মার ছায়া রেখেছেন, কিন্তু আব্বার ছায়া উঠে গেছে। 'শরীরী জীবনের' মত আমার ইলমী জীবনেরও প্রতিটি অণুপরমাণু তাঁর ত্যাগ ও আত্মত্যাগের কাছে চিরঋণী। আমাকে গড়ার জন্য নিজেকে তিনি তিলে তিলে ক্ষয় করেছেন। অবশেষে বিগত ১৭ই মুহররম রাত আটটা ত্রিশ মিনিটে তিনি ইনতিকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।) আমার অক্ষম হৃদয়ের প্রার্থনা, আল্লাহ যেন তাঁকে পূর্ণ শান্তিতে রাখেন, আার এ প্রার্থনায় যারা 'আমীন' বলে, আল্লাহ যেন তাদেরও উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন!

আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক আরবীভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, আশরাফাবাদ
ঢাকা – ১৩১০

৫ – ৪ – ২৩ হিজরী

---

১. আরবী কবিতার একটি পংক্তি থেকে নেয়া من طلب العلا سهر الليالي – উচ্চ মর্যাদার অভিলাষী যারা বিনিদ্র রজনীর সাধনায় নিমগ্ন তারা।

رسولِ عربی

یعنی

پیغمبرِ اسلام حضرت محمدؐ صاحب کی سوانح عمری

ایک آپکے سکھ مدّاح،

گوردت سنگھ دارا بیرسٹر ایڈوکیٹ (لاہور ہائیکورٹ)

ایڈیٹر "انڈیا" لندن،

کے قلم سے

باہتمام مسعود علی ندوی

مطبوعہ معارف پریس اعظم گڈہ

মূলগ্রন্থ 'রাসূলে আরাবী'-এর নাম-পৃষ্ঠার ফটোকপি। মূলকপিটি ভারতের নাদওয়াতুল উলামা লৌখনো-এর কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে।

অবস্থা হলো। চোখের পলকে তার দ্বিখণ্ডিত দেহ বালুর উপর তড়পাতে লাগলো। দুর্গ-রক্ষক মুরাহ্হাব তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে একদল যোদ্ধাসহ দুর্গ ছেড়ে নেমে এলো। তাতে হযরত আলীর ইচ্ছা যেন পূর্ণ হলো। আলী হায়দারের জুলফিকার লাল হলো আবার মুরাহ্হাবের খুনে। অন্যরা তখন পালিয়ে বাঁচলো দুর্গের ভিতরে। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেলো দুর্গের ফটক। কিন্তু আলী তখন আলী নন, তিনি তখন শেরে খোদা। দু'হাতে টান দিয়ে তিনি উপড়ে ফেললেন দুর্গের বিশাল ফটক। অথচ পরবর্তীতে কয়েকজন মিলেও তা নাড়তে পারেনি একচুল। এরপর দুর্গের পতন হলো এবং ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করলো। এত কিছুর পরও আল্লাহর রাসূল তাদের প্রতি সদয় ও ক্ষমাসুন্দর আচরণ করলেন এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বহাল রাখলেন।

ইহুদীরা তবু কিন্তু তাদর স্বভাবচক্রান্ত ত্যাগ করেনি। এমন কি আল্লাহর রাসূলের প্রাণনাশেরও ঘৃণ্য চেষ্টা করেছিলো তারা। খায়বারযুদ্ধে যয়নবনাম্নী এক ইহুদী স্ত্রীলোকের কতিপয় স্বজন নিহত হয়েছিলো। সে তখন কালনাগিনীর রূপ ধারণ করলো এবং মরণ ছোবল হানার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো। ইসলামের নবীকে হত্যা করে তবে সে শান্ত হবে, এই প্রতিজ্ঞা করলো। প্রিয়নবী সরল বিশ্বাসে একদিন উক্ত ইহুদিনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, আর সে বিষমিশ্রিত খাবার এগিয়ে দিলো। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবার মুখে দিয়েই বুঝে ফেললেন এবং অন্যান্যদের সাবধান করে দিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ইহুদিনী অপরাধ স্বীকার করলো এবং এই অজুহাত পেশ করলো যে, ভেবেছিলাম আপনি যদি সত্য নবী হন তাহলে বিষে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, আর যদি অসত্য হন তাহলে আপনার যন্ত্রণা থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাবো।

এত বড় অপরাধও রহমতের নবী ক্ষমা করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিষক্রিয়ার কষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু ইহুদিনীকে একবারও তিরস্কার করেননি।

ঐ সময় গাসসানী শাসককেও আল্লাহর রাসূল পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই শাসক ইসলাম ও নবী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই নবীর দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে,

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমরের শাসনামলে তিনি মুরতাদ হয়ে যান। ঘটনা এই যে, রাজকীয় আভিজাত্য ও অহংকারবশত জনৈক নিরপরাধ মুসলমানকে একবার তিনি চড় মেরে বসলেন। খলীফা ওমর বললেন,

ইনসাফের বিচার এই যে, তুমি মজলুম থেকে ক্ষমা গ্রহণ করো, কিংবা কিছাছ রূপে তাকে চপেটাঘাত করার সুযোগ দাও। শরীয়তের বিধান রাজা-প্রজা ও শাসক-শাসিত সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

গাসসানী শাসক ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, ইতর-ভদ্রের কোন তমীয নেই, এ কেমন ধর্ম!

হযরত ওমর বললেন, দেখো, ইনসাফ ও আখলাক তথা চরিত্র ও ন্যায়বিচার হলো ইসলামের বুনিয়াদ। এখানে সকলে মানুষ, সকলে সমান। শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ো না। সমর্পিত চিত্তে মেনে নাও শরীয়তের বিধান। গাসসানী শাসক দেখলেন, এখানে থেকে হয় মান, না হয় প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। তাই তিনি মুরতাদ হয়ে সোজা পাড়ি জমালেন রোমশাসিত সিরিয়ায়। তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীকালে তিনি পুনঃইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

***

হোদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক পরবর্তী বছর আল্লাহর রাসূল ও তাঁর ছাহাবীগণ মক্কায় প্রবেশ করলেন। বায়তুল্লাহর ছায়ায় তাদের দীর্ঘ কালের বিরহ-দগ্ধ হৃদয় যেন শান্ত হলো। জমজমের সুশীতল পানিতে তাদের তৃষিত আত্মা যেন তৃপ্তি পেলো। ওমরা পালন করার পর আল্লাহর নবী কোরেশকে অনুরোধ করে বললেন–

আর কিছু না হোক বায়তুল্লাহর মেহমান হিসাবে আরেকটু সময় আমাকে থাকতে দাও। তিনি বড় আশা করেছিলেন যে, তাঁর এ মর্মস্পর্শী আবদেন বিফলে যাবে না। মেহমানসেবার আরবীয় ঐতিহ্য কোরেশ ভোলবে না। কিন্তু কোরেশ তখন হাশিম, আবদুল মুত্তালিব ও আবু তালিবের কোরেশ ছিলো না। তাই যে মেহমানের পবিত্র পদধূলি হতে পারতো তাদের ললাটের 'স্বর্ণধূলি', দুর্ভাগা কোরেশ তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করলো এই বলে–

'তিন দিন তো শেষ হলো; এবার ফিরে যাও।'

আমেনার দুলাল, হে মুহাম্মদ! মক্কার কোরেশ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু ভারতমাতা একবার যদি লাভ করতো তোমার পবিত্র পদধূলি তাহলে 'চন্দনধূলি' রূপে সে তা কপালে মেখে ধন্য হতো।

আল্লাহর নবী তাদের কথা শুনলেন এবং নিজগুণে তাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। তারপর ক্ষমাসুন্দর এক অপূর্ব হাসি তাদের উপহার দিয়ে বললেন– 'আচ্ছা তাই হবে। আমি ফিরে যাবো, তবু তোমাদের শুভ হোক; তবু তোমাদের কল্যাণ হোক।'

সে ক্ষমাসুন্দর হাসির স্বর্গীয় উদ্ভাস ও সুস্নিগ্ধতা মক্কার বহু হৃদয়ে রেখাপাত করেছিলো এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। ওহুদযুদ্ধে যার তলোয়ার বদলে দিয়েছিলো জয়-পরাজয়ের নকশা, সেই মহাবীর খালিদ লুটিয়ে পড়লেন প্রিয়নবীর পদপ্রান্তে। রাজা নাজ্জাশীর দরবারে যিনি গিয়েছিলেন কোরেশের দূত হয়ে, সেই আমর বিন আছও হলেন একই পথের পথিক। এ দুই যুবকশ্রেষ্ঠের ইসলাম গ্রহণ শাব্দিক অর্থেই কোরেশের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলো।

জাহেলী যুগের খালিদ-আমর ছিলেন আরব-বিখ্যাত, কিন্তু ইলামের ছায়াতলে এসে তাঁরা হলেন জগদ্বিখ্যাত।

***

দরবারে রিসালত থেকে বসরার শাসনকর্তার নামে দাওয়াতপত্র প্রেরিত হয়েছিলো। দূত ছিলেন হযরত হারিছ। রোমসম্রাটের সভাসদ শুরাহবীল বিন আমরের হাতে দূত নিহত হলেন। দূতহত্যা সর্বযুগেই জঘন্য অপরাধ। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষ এমনই অন্ধ করে রেখেছিলো তাদেরকে যে, নীতি ও নৈতিকতা সব কিছু বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না তারা।

এ ধরনের রাষ্ট্রীয় অপরাধ উপেক্ষা করার অবকাশ ছিলো না। কেননা এর সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও মুসলিমদূতগণের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত ছিলো। তাই আল্লাহর রাসূল শত্রুকে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিন হাজার জানবায মুজাহিদের এক বাহিনী মদীনা থেকে

রওয়ানা হলো এবং মুতা নামক স্থানে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হলো। রোমক সভাসদ শুরাহবীলের ভাই নিহত হলো। সে নিজে দুর্গে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো এবং হাড়ে হাড়ে টের পেলো যে, দরবারে রিসালতের দূতকে হত্যা করা ছেলেখেলা নয়, অগ্নিখেলা। উপায়ান্তর না দেখে সে রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। তখন এক লক্ষ সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী এসে যোগ দিলো তার সাথে। অপর পক্ষে মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! বিশাল সমুদ্রে যেন একটা কাগজের নৌকা। পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে এমন অসম সৈন্য সমাবেশের খবর অন্তত আমাদের জানা নেই।

স্বভাবতই মুসলিম বাহিনীতে কিছুটা চিন্তা, কিছুটা দ্বিধা দেখা দিলো। কিন্তু সিপাহসালার আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা তার ক্ষুদ্র বাহিনীর সামনে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করলেন, যার প্রতিটি শব্দ ছিলো ঈমান ও বিশ্বাসে বলীয়ান হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তিনি বললেন–

‘হে রাসূলের ছাহাবীগণ! কী হলো তোমাদের, শত্রুর সংখ্যাধিক্যে কেন তোমরা চিন্তিত? আমরা তো সংখ্যার সাহায্যে লড়াই করি না। মনে রেখো, বিজয়ী বেশে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য আমরা আসিনি। আমরা এসেছি শাহাদাতের আবেহায়াতে ঠোঁট ভিজিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে। সুতরাং অগ্রসর হও, ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং খুনের দরিয়ায় সাঁতার দিয়ে জান্নাতের সবুজ বাগিচায় গিয়ে হাজির হও!’

সিপাহসালারের ভাষণ মুজাহিদদের হৃদয়ে যেন ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলো। তিন হাজার ঘুমন্ত শার্দুল যেন জেগে উঠে রোমের লক্ষ ভেড়ার পালে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রোমক সেনাপতির জন্য এ দৃশ্য ছিলো কল্পনারও অতীত।

ঘোরতর যুদ্ধ হলো সারাটা দিন। হাঁ, একশ হাজারের মোকাবেলায় তিন হাজার! সারাটা দিন লড়াই চললো মরণপণ। হিমালয়ের দৃঢ়তাও বুঝি হার মানে তিন হাজার মুজাহিদের কাছে। রোমক সেনাপতি সীমাহীন পেরেশানির মাঝে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছেন যুদ্ধের অভাবনীয় দৃশ্য। একদিকে লক্ষাধিক সৈন্যের মৃত্যু ভয়ে কম্পমান অবস্থা, অন্যদিকে যেন

স্বয়ং মৃত্যুকে ধাওয়া করা। কোন্ শক্তিবলে, কিসের আকর্ষণে এমন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিসর্জন! এ ভাবনার কোন সমাধান খুঁজে পান না রোমের সেনাপতি। তার তখন অন্য ভাবনা শুরু হলো, কীভাবে যুদ্ধটাকে একটা সম্মানজনক সমাপ্তির দিকে টেনে নেয়া যায়!

সন্ধ্যার দিকে যুদ্ধবিরতি হলো। উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলো। প্রিয় নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম বাহিনীর তিন সিপাহসালার একে একে শহীদ হয়েছেন এবং শেষ মুহূর্তে মহাবীর খালিদ ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছেন।

পরবর্তী সকালে সেনাপতি খালিদ যুদ্ধের ছক পরিবর্তন করে মুসলিম বাহিনীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন। পিছনের সারি সামনে এবং সামনের সারি পিছনে নিয়ে এলেন। তাঁর এ কৌশল ছিলো অতি উচ্চ সামরিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। উদ্দেশ্য ছিলো শত্রুকে গতকালের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে না দেয়া। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের চাপ সবার উপর সমানভাবে ফেলা এবং অগ্রসারির ক্লান্ত যোদ্ধাদের পিছনে এনে কিঞ্চিত বিশ্রামের সুযোগ দেয়া। তৃতীয়ত, শত্রুপক্ষের মনে এ ধারণা দেয়া যে, মদীনা থেকে হয়ত তাজাদম সৈন্যের যোগান এসেছে। বলাবাহুল্য, সেনাপতি খালিদের এ অভিনব যুদ্ধকৌশলের সব ক'টি উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিলো। ক্ষুদ্র মুসলিমবাহিনীর শৌর্যবীর্য ও প্রবল প্রতিরোধ রোমক বাহিনীকে এমনিতেই হতবিহ্বল করে দিয়েছিলো। তদুপরি নতুন প্রভাতে নতুন সেনাপতির নতুন যুদ্ধকৌশল তাদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করলো। ফলে তাদের হামলার ধার ও ভার কিছুটা কমে এলো। আর এই সামান্য সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সেনাপতি খালিদ তাঁর বাহিনীকে অতি সুশৃঙ্খলভাবে বের করে আনলেন। এভাবে ইতিহাসের সবচে' বড় অসম যুদ্ধটি মুসলিমবাহিনীর অনুকূলে সমাপ্ত হলো।

মুতাযুদ্ধের ঝাণ্ডা আল্লাহর রাসূল হযরত যায়দকে দান করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর জাফর ঝাণ্ডা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাফরের শাহাদাত ছিলো বড় ঈর্ষণীয়। জখমি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েও তিনি ডান হাতে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখলেন। সে হাত যখন কাটা গেলো তখন ঝাণ্ডা চলে এলো বাঁ হাতে। বাঁ হাতও যখন কাটা গেলো তখনও তিনি দু'হাতের

গোড়া দিয়ে বুকে চেপে উঁচিয়ে রাখলেন ইসলামের ঝাণ্ডা। এভাবে এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হলেন এই বীর সেনাপতি। দেখো, পৃথিবীর আর কোন জাতির যুদ্ধের ইতিহাসে এমন আত্মবিসর্জনের নযীর খুঁজে পাও কি না।

এবার দেখো হযরত জাফরের সৌভাগ্যের নমুনা। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল তাঁর শাহাদাত বিষয়ে অবগত হলেন। তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হলো, কিন্তু মুখের মৃদু মধুর হাসি ছিলো অম্লান। মনে হলো, কোন আনন্দবার্তা এসেছে আসমান থেকে। সমবেত ছাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন−

আমি দেখতে পাচ্ছি, জাফরকে আল্লাহ তা'আলা দু'টি ডানা দান করেছেন। আর তিনি জান্নাতের বাগিচায় মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তখন থেকে তাঁর নাম হলো জাফর তাইয়ার (উড়ন্ত জাফর)।

হেলালী ঝাণ্ডা বহনকারী তৃতীয় সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও শহীদ হলেন। সুতরাং বুঝে দেখো, কী ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিলো সেদিন মুতার মাঠে, এক লাখ রোমক যোদ্ধা এবং তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদের মাঝে!

জিহাদের উদ্দেশ্যে তাদের বিদায় কালে আল্লাহর রাসূল এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যায়েদ শহীদ হলে জাফর এবং জাফর শহীদ হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ঝাণ্ডা বহন করবেন। তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে মুসলমানগণ পরামর্শক্রমে আমীর নির্বাচন করবেন। যুদ্ধের সেই নাযুকতম মুহূর্তে মুসলিমবাহিনীর বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার সুকঠিন দায়িত্ব নিতে হয়েছিলো খালিদ বিন ওয়ালীদকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনায় মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছিলেন−

'এখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। তিনি সায়ফুল্লাহ− তিনি আল্লাহর তলোয়ার।'

এর চে' বড় পুরস্কার কী হতে পারে আর! ধন্য তুমি হে খালেদ! ধন্য তোমার তলোয়ার। কেননা তুমি স্বয়ং আল্লাহর তলোয়ার।

চতুর্থ অধ্যায়

হোদায়বিয়া-সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিলো এই যে, একে অন্যের মিত্র গোত্রের উপর আক্রমণ করতে পারবে না, কিন্তু দু'বছরের মাথায় কোরেশ নিজেই সে শর্ত ভঙ্গ করলো। মক্কার উপকণ্ঠের দুই বিবাদমান কবিলা খোযাআহ ও বনু বকর ছিলো যথাক্রমে মুসলমানদের ও কোরেশদের মিত্র। তাদের বিবাদ যখন যুদ্ধের রূপ নিলো তখন কোরেশ সরাসরি বনু বকরের পক্ষে জড়িয়ে পড়লো। এটা ছিলো হোদায়বিয়া-সন্ধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তদুপরি খোযাআহ গোত্রের প্রতিনিধি দল দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ফরিয়াদ জানালো এবং মৈত্রীর দাবীতে সাহায্য প্রার্থনা করলো। প্রিয় নবী এ কথাও অবগত হলেন যে, হারাম শরীফে আশ্রয় নিয়েও কোরেশের তলোয়ার থেকে রেহাই পায়নি খোযাআহ গোত্রের লোকেরা। অথচ হযরত ইবরাহীমের যুগ থেকে পবিত্র হারাম হলো নিরাপদ এলাকা, আশ্রয় গ্রহণকারী এমনকি অপরাধী হলেও।

ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রিয় নবী ঘোষণা করলেন–

'কোরেশের অপরাধের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন কি হারামের অবশিষ্ট মর্যাদাটুকুও তারা ভূলুণ্ঠিত করেছে। সুতরাং কোরেশকে এবার তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। তাছাড়া খোযাআহ গোত্রের আবেদন ও ফরিয়াদ উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা মক্কা অভিযান করবো।'

এ ঘোষণায় মুসলমানদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেলো। বিশেষত মুহাজিরদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো অপরিসীম। একদিন যারা সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে জন্মভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই মক্কার বদ্ধ দুয়ার এবার তাদের জন্য খুলে যাবে, এবার তারা প্রাণভরে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও যিয়ারত করতে পারবেন, এর চেয়ে আনন্দের, এর চেয়ে পুলকের বিষয় আর কী হতে পারে!

কয়েক হাজার ছাহাবার কাফেলা নিয়ে আল্লাহর রাসূল মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করলেন। পথে বিভিন্ন বস্তির মুসলমানগণ কাফেলায় শরীক হলেন। এভাবে সফরের আখেরী মঞ্জিলে কাফেলার সংখ্যা হলো বার

হাজার, যাদের সকলে ছিলো পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। কেননা এটা ছিলো মক্কাবিজয়ের অভিযান।

মক্কার উপকণ্ঠে মুসলিম বাহিনীর তাঁবু স্থাপনের পর বড় মনোরম দৃশ্যের অবতারণা হলো। রাতের বেলা প্রান্তর জুড়ে আলো আর আলো, যেন আলোক নগরী! আল্লাহর রাসূল মক্কাঅভিযানে এমনই গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন যে, মুসলিম বাহিনী মক্কার দোরগোড়ায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কোরেশ কিছুই বুঝতে পারেনি। এর উদ্দেশ্য ছিলো রক্তপাত এড়ানো।

সুরতেহাল দেখে কোরেশনেতৃবর্গ স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। আবু সুফয়ানের তো একেবারে দিশেহারা অবস্থা! কোথায় যাবেন, কার আশ্রয় নেবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় তিনি মুসলিম শিবিরের কাছাকাছি এসে ঘটনাক্রমে হযরত আব্বাসের সামনে পড়ে গেলেন এবং তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, আপনি আমাদের শেষ ভরসা, ধ্বংসের হাত থেকে কোরেশকে রক্ষা করুন।

আব্বাস বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা করো। শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহর উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের শরণাপন্ন হও। তিনি সবার জন্য রহমত, তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন। আমি তাঁর নিকট তোমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করবো।

'আল্লাহর দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হোক' এই ছিলো হযরত ওমরের দাবী, কিন্তু রহমতের নবী কোরেশনেতা আবু সুফয়ানকে নিরাপত্তা দান করলেন। এই ক্ষমাসুন্দর আচরণ আবু সুফয়ানকে এমনই অভিভূত করলো যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বললেন–

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– আল্লাহ ছাড়া নেই কোন ইলাহ। আর তুমি হে মুহাম্মদ! আল্লাহর সত্য রাসূল।

খুনখারাবি ও রক্তপাত আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্য নয়। তিনি তো এসেছেন বায়তুল্লাহকে শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে পবিত্র করতে। তাই মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বেই তিনি ঘোষণা করলেন–

'যারা কাবাঘরে আশ্রয় গ্রহণ করবে, কিংবা স্ব-স্ব গৃহে অবস্থান করবে,

কিংবা আবু সুফয়ানের গৃহে একত্র হবে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হলো।'

কত মহান তুমি হে মুহাম্মদ! কী মহৎ হৃদয় তোমার হে আহমদ! পরাজিত শত্রুর প্রতি তোমার এমন ক্ষমাসুন্দর আচরণ! এমন সম্মানজনক ব্যবহার! আল্লাহ সত্যই বলেছেন, তুমি মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাই তো আজ চৌদ্দশ বছর পরও তোমার পবিত্র চরণে আমি অধম ভক্তিচুম্বন নিবেদন করি।

আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দিলেন, কোন উঁচু স্থান থেকে আবু সুফয়ানকে মুসলিম বাহিনীর মক্কাপ্রবেশের দৃশ্য অবলোকন করাও, যাতে ইসলামের শানশওকত দেখে তার সদ্য আলোকিত হৃদয়ে হক ও ঈমান দৃঢ়মূল হতে পারে এবং কোরেশকে বাস্তব অবস্থা বুঝিয়ে সংযত রাখতে তিনি সক্ষম হন।

হযরত আব্বাস আবু সুফয়ানকে নিয়ে একটি উঁচু টিলায় দাঁড়ালেন।

মুসলিম বাহিনীর একটি করে দল টিলার পাশ দিয়ে ঝাণ্ডা হাতে এগিয়ে যায় আর আবু সুফয়ান অবাক চোখে তা অবলোকন করেন। আরব জাহেলিয়াতের বহু বিজয় তিনি দেখেছেন, দেখেছেন বিজয়ী বাহিনীর গর্বিত চাল ও উদ্ধত আচরণ। কিন্তু এখানে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য! সবার মুখে তকবীর ধ্বনি। তাতে ঈমানের প্রত্যয় ও দৃঢ়তা আছে, কিন্তু বিজয়ের দম্ভ ও অহংকার নেই। কাফেলার সারি একের পর এক এগিয়ে চলেছে, তার যেন আর শেষ নেই। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! আবু সুফয়ানের অন্তরে সত্যলাভের অপূর্ব পুলক এবং পরাজয়ের তিক্ত গ্লানির আশ্চর্য এক লুকোচুরি খেলা চলছিলো। এক পর্যায়ে হযরত আব্বাসকে তিনি বললেন, তোমার ভাতিজা তো দেখছি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছেন!

হযরত আব্বাস সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী আবু সুফয়ানের ভুল শুধরে দিয়ে বললেন, এটা রাজত্বের জৌলুস নয়, নবুয়তের শান।

প্রিয় নবীর অনুমতিক্রমে আবু সুফয়ান আগেই মক্কায় পৌঁছলেন, যাতে কোরেশকে তার শেষ নির্বুদ্ধিতা থেকে রক্ষা করা যায়। কোন আত্মঘাতী পদক্ষেপ যেন কোরেশ না নিয়ে বসে। তিনি কাবাপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন–

'হে মক্কাবাসী! এই মাত্র আমি মুসলিমশিবির থেকে এসেছি। নিজের চোখে মুহাম্মদের শক্তি ও শান-শওকত দেখে এসেছি। আমার কথা শোনো, ধ্বংসের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে যুদ্ধের চিন্তা পরিত্যাগ করো এবং অস্ত্র সম্বরণ করো। বায়তুল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করো, কিংবা আপন গৃহে অবস্থান করো। আর যদি ইচ্ছা করো তাহলে আমার গৃহে প্রবেশ করতে পারো- এই শর্তে তোমাদের জন্য আমি নিরাপত্তার আশ্বাস এনেছি।

আর শোনো, আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা শিরক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করো। আল্লাহকে এক বলে এবং মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করো। দেখো, দেব-দেবী আমাদের সর্বনাশ করেছে, আর মুহাম্মদের রব তাঁকে বিজয় দান করেছেন। সুতরাং অসত্য বর্জন করো এবং সত্য গ্রহণ করো। আমি ঈমান এনেছি, তোমরাও ঈমান আনো। আমি মুক্তির পথ ধরেছি, তোমরাও সে পথ ধরো।'

আবু সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দা এ সময় ছুটে এসে আবু সুফয়ানের দাড়ি টেনে ধরলেন এবং চিৎকার করে বললেন,

'নির্লজ্জ কাপুরুষ! নিজে পূর্বপুরুষের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছো, এখন আমাদেরও প্ররোচনা দিচ্ছো! মক্কার আকাশে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা, যখন প্রয়োজন শত্রুর মোকাবেলায় সিংহবিক্রমের- তখন একি কাপুরুষের কথা শুনি তোমার মুখে!

হে বীর কোরেশ! কোথায় গেলো তোমাদের পৌরুষ! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ! খতম করো এই ধর্মত্যাগীকে। ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর উপর। জীবন দিয়ে রক্ষা করো দেবতাদের লাজ।'

কিন্তু দেবতাদের তখন লাজ-শরমের বালাই ছিলো না। বেচারাদের তখন বড় দুঃসময়। হিন্দার কথা শেষ না হতেই শোনা গেলো তকবীর ধ্বনি। সেই সাথে শুরু হলো ভীষণ ছোটাছুটি।

***

رسولِ عربی

ہر لحظہ بشکلِ بتِ عیار برآمد — ہر دم بہ لباسِ دگران یار برآمد

القصہ ہمون بود کہ می آمد و میرفت — تا عاقبت آن شکلِ عرب وار برآمد

ایک صاحبِ کمال آیا جس نے جلوۂ حق دکھایا، جس کسی نے اُسے پریم کی انکھڑیون سے دیکھا، اوس کی تمنائے زندگی پوری ہو گئی، جسکی نگاہِ شوق اس پر پڑ گئی اُسے منہ مانگی مراد مل گئی، جلوۂ حق

جس بشر کو اس موہن نے اپنا درشن دیا، اس کے جنم بھر کا پاپ کٹ گیا،

آنانکہ خاک را بنظر کیمیا کنند — آیا بود کہ گوشۂ چشمے بما کنند

اے عرب کے رہنے والو، کیا ہی اچھے ہونگے تمھارے بھاگ، اور کیا ہی نیک ہونگے تمھارے بخت، جو تمنے نورِ خدا کو اپنی آنکھون دیکھا، حبیبِ خدا کو اپنی آنکھون تاکا، تمھارے وقت پر کل جگ کا پہرہ نہ تھا، وہ ست جگ کا سمان ہی ہوگا، اے عرب والو، تم شاید کوئی عارف باللہ ہو گے، یا ہوگے کوئی دیوی دیوتے، ورنہ عام انسان کے بھاگ مین کہان اس بھگوان کے درشن! یہ بڑا درلبھ ہے، یہ کہان ممکن،

اے ایک عرب، اے بن اور بیابان کے داس، اے ریگ و ریگستان کے گھرانے

'রাসূলে আরাবী'-এর প্রথম পৃষ্ঠার ফটোকপি।

মুসলমানগণ প্রায় বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। আবু জেহেলপুত্র ইকরামা অবশ্য কিছুটা হাঙ্গামা করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন 'আল্লাহর তলোয়ার' খালিদ বিন ওয়ালীদ। তাই ত্রিশটি লাশ ফেলে ইকরামা পালিয়ে বাঁচলেন। অবশ্য তিন জন মুসলমানও শহীদ হলেন এ সঙ্ঘর্ষে।

আল্লাহর রাসূল যে উটনীর উপর সওয়ার হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তার নাম 'কাছওয়া'। দাস-পুত্র উসামা বিন যায়দ ছিলেন তাঁর সহআরোহী। মাথায় ছিলো কালো আমামা। মুখে বিজয়ের হাসি নেই, আছে ক্ষমার সৌন্দর্য দীপ্তি। চোখে আছে অশ্রুর ঝিলিক, সে অশ্রু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার।

দেশের পর দেশ পদানত করে, জনপদের পর জনপদ ধ্বংস করে এবং রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে যারা বিজয়ের গর্ব করো এবং সভ্যতার দাবী করো– তারা মক্কাবিজয়ী মুহাম্মদের সামনে অবনত মস্তকে একবার এসে দাঁড়াও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো, কেন যুদ্ধ করবে, কীভাবে যুদ্ধ করবে এবং দেশজয়ের পর কীভাবে আত্মার উপর বিজয় লাভ করবে, তাহলে মানবসভ্যতার কলংক না হয়ে হতে পারবে তার গর্ব ও গৌরব।

আল্লাহর রাসূল সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। তারপর ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে অধিষ্ঠিত মূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে দিলেন। সে সময় তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন–

جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا

'সত্য এসেছে' মিথ্যার বিনাশ হয়েছে। মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।'

আল্লাহর ঘর যখন মূর্তির অস্তিত্ব হতে পবিত্র হলো তখন আল্লাহর রাসূল কাবার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ভীত-সন্ত্রস্ত কোরেশ সেখানে সমবেত। অতীতের সকল অপরাধ একে একে মনে পড়ছে তাদের। আল্লাহর রাসূলের পথে যারা কাঁটা বিছিয়ে দিতো, সিজদারত অবস্থায় তাঁর পাক শরীরে আবর্জনা ঢেলে দিতো, আরো বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিতো; দীর্ঘ তিন বছর যারা তাঁকে ও হাশেমী পরিবারকে সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করেছিলো, তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর

যারা তাঁর মক্কা প্রবেশে বাধা প্রদান করেছিলো, আর সর্বশেষ যারা হিজরতের রাতে তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করেছিলো তারা সকলে আজ কাবাপ্রাঙ্গনে সমবেত। সবার চোখে মুখে ভয়ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট। তাদের ভাগ্য, তাদের জীবন-মৃত্যু আজ আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের হাতে। ইচ্ছা করলেই তিনি পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। কেননা কোরেশের প্রত্যেক অপরাধীর গর্দান এখন তাঁর তলোয়ারের নাগালে। পৃথিবীর যে কোন বিজয়ী সেনাপতির ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণই তো স্বাভাবিক। মুহাম্মদ কি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, না ক্ষমা করবেন? আমাদের মুক্তির বার্তা উচ্চারিত হবে, নাকি ধ্বংসের ফায়সালা জারি হবে তাঁর মুখ থেকে। কিন্তু আমেনার পুত্র মুহাম্মদ তো বড় ভালো মানুষ। হোদায়বিয়ার সন্ধি যেদিন হলো সেদিন যে উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে কি প্রতিশোধের কথা কল্পনা করা যায়!

কোরেশের সমবেত নারী-পুরুষ যখন আশা-নিরাশার এই দোদুল্যমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলো, তখন আল্লাহর রাসূল তাদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে কোরেশ! তোমাদের সাথে আমি আজ কিরূপ আচরণ করবো বলে ভাবছো?

আল্লাহর রাসূলের নূরানী চেহারায় তখন কী এক ভাবের উদ্ভাস তারা দেখতে পেয়েছিলো যা তাদের মনে বড় আশার সঞ্চার করেছিলো। তাই তারা একবাক্যে বলে উঠলো–

'আমরা উত্তম কিছু আশা করি। কেননা তুমি আমাদের মহান ভাই এবং এক মহান ভাইয়ের মহান পুত্র।'

তবু ভাগ্য ভালো কোরেশের, এমন একটি সুন্দর উত্তর তারা দিতে পেরেছিলো। দয়ার নবীর দানরূপে ক্ষমা তো তারা এমনিতেও পেয়ে যেতো, কিন্তু এ অপূর্ব সুন্দর উত্তরের মাধ্যমে কিছুটা হলেও এ ক্ষমা তারা অর্জন করে নিলো।

আল্লাহর নবী শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'যাও তোমরা মুক্ত। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আজ প্রতিশোধ গ্রহণের দিন নয়, অনুগ্রহ প্রকাশের দিন।

প্রিয় পাঠক, আমার কলমের অক্ষমতা ক্ষমা করো। স্ব-স্ব বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে যে যতটুকু শিক্ষা এখান থেকে নিতে পারো নাও। আমার কিছু বলার নেই, লেখার নেই। এখানে, এই মুহূর্তে আমি নিজেও অনুভবের জগতে তন্ময় হয়ে থাকতে চাই।

মহামুক্তির মহাআনন্দে কোরেশ অভিভূত হলো। আল্লাহর রাসূল শান্তির পথে যেমন মক্কা জয় করলেন, তেমনি ক্ষমা ও দয়ার পথে কোরেশের হৃদয় জয় করলেন। তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলো।

***

ইকরামা বিন আবু জেহেল পলাতক ছিলেন। তার স্ত্রী ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা করলেন। আর আল্লাহর রাসূল মক্কাবিজয়ের দিন একমাত্র অস্ত্রধারণকারী ইকরামা বিন আবু জেহেলের সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে তার প্রাণদণ্ড মওকুফ করলেন। এমন কি নিরাপত্তা লাভের পর ইকরামা যখন হাজির হলেন তখন আল্লাহর রাসূল এমন উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে তাকে স্বাগত জানালেন যেন দীর্ঘদিন পর আপনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

এভাবে আবু জেহেলের পুত্র ইকরামাও সত্যের আলো গ্রহণের সুযোগ লাভ করলেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করে অবশেষে শাহাদাতের মহাসৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল দয়া ও অনুগ্রহের পরিবর্তে যদি ইনসাফের বিচার করতেন?

হাব্বার নামক জনৈক ব্যক্তির অপরাধ ছিলো অতি গুরুতর। নবীকন্যা হযরত যয়নব অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করছিলেন তখন এই হাব্বারই বর্শা নিক্ষেপ করে তাঁকে সওয়ারির উপর থেকে ফেলে দিয়েছিলো। ফলে গর্ভপাত হয়ে সেখানেই তাঁর মৃত্যুর ঘটেছিলো। এ অপরাধও রহমতের নবীর কাছে ক্ষমার অযোগ্য মনে হলো না। তাকেও তিনি ক্ষমা করে কাছে টেনে নিলেন।

কবি কা'আব বিন যোহায়র আল্লাহর রাসূলের নিন্দা করে জঘন্য কবিতা লিখতো। সে কবিতা কোরেশকে যেমন 'গলীজ' আনন্দ দিতো তেমনি মুসলমানদের কলিজায় রক্ত ঝরাতো। সেই কবি কা'আব বিন যোহায়ারও প্রিয় নবীর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাজাত পেলেন।

প্রিয় চাচা হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী যখন আল্লাহর রাসূলের সামনে উপস্থিত হলো তখন আল্লাহর রাসূলের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো! তাকে দেখামাত্র আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি সেই ওয়াহশী?

লজ্জা, অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতাভারে ওয়াহশীর মস্তক তখন অবনত। কোনক্রমে শুধু বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই দুর্ভাগা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল।

প্রিয় নবী ওয়াহশীর ইসলাম গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারপর একটি কথা বললেন। রহমতের নবীর সেই একটি মাত্র কথায় তুমি অনুভব করতে পারো, তখন তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো। তিনি বললেন–

'শোনো, তুমি কখনো আমার সামনে এসো না। কেননা তোমাকে দেখলে আমার মনে যে কষ্ট হবে তাতে তোমার অকল্যাণ হবে। এটা আমার অনুরোধ।'

ওয়াহশী প্রিয় নবীর 'অনুরোধ' রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় কোনদিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াননি তিনি। এমন কি এরপর কেউ কোন দিন হাসতে দেখেনি ওয়াহসীকে। শুধু সেই দিন তিনি বড় তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন যেদিন মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার মুসায়লামাতুল কাযযাব তাঁর হাতে নিহত হয়েছিলো। সে দিন তিনি বলেছিলেন–

'আল্লাহর শোকর, নবীর প্রিয়তম ব্যক্তি যেমন আমার হাতে শহীদ হয়েছেন তেমনি আজ ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমনও আমার হাতে জাহান্নামী হয়েছে।

এরপর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার পালা। হযরত হামযার বুক চিরে

কলজে চিবিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলো যে নারী সে হয়ত তখন ভাবছিলো, আর সবার ক্ষমা হলেও আমার অপরাধ তো অমার্জনীয়। কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবো তাঁর সামনে। কীভাবে বলবো, ক্ষমা করো হে মুহাম্মদ!

কিন্তু আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখের ক্ষমাসুন্দর হাসি যেন তাকে বুঝিয়ে দিলো, রহমতের দুয়ার তারও জন্য উন্মুক্ত। দয়া ও করুণার ভাণ্ডার তারও জন্য অবারিত।

***

সে সময় সম্ভ্রান্ত বংশের জনৈকা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হলো। ফলে আল্লাহর রাসূল শরীয়ত অনুযায়ী তার হস্তকর্তনের আদেশ জারি করলেন। কোরেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রিয় নবীর খিদমতে জোর আবদার করে বললো, এটা অভ্যাসবশত নয়, বরং দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটে গেছে। সুতরাং কোরেশবংশের মর্যাদা রক্ষার্থে অনুগ্রহপূর্বক তার শাস্তি মওকুফ করুন।

এ অন্যায় আবদারে আল্লাহর রাসূল এমনই নাখোশ হলেন যে, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ছাপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন–

'আল্লাহর বিধান সকলের জন্য সমান। পূর্ববর্তী উম্মত এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট-সাধারণের পার্থক্য করা হতো।

যার হাতে মুহম্মদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! মুহম্মদ-কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে তারও হস্তকর্তনের আদেশ দিতাম।'

সুবহানাল্লাহ! আগে ও পরে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বহু আইন ও সংবিধান প্রণয়ন করেছে এবং তা মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রশংসাও কুড়িয়েছে। কিন্তু ইনসাফ ও সমতার এমন সমুজ্জ্বল উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে আর কোথাও?

***

মক্কা বিজয়ের ঘটনায় হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্র খুবই বিচলিত হলো। তারা ভাবলো, সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। মুহাম্মদের শক্তিকে এখনই যদি খর্ব করা না যায় তাহলে অচিরেই তাদেরকেও কোরেশের ভাগ্য বরণ করতে হবে। সুতরাং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো পুরোদমে। অবশেষে পরীক্ষিত যোদ্ধাদের এক বিরাট বাহিনী মক্কাঅভিযানে রওয়ানা হলো। সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল বার হাজার যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে তাদের প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হলেন। মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে উভয় পক্ষের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। মুসলমানগণ প্রথমে কিছুটা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হলো। শত্রুপক্ষ শোচনীয়রূপে পরাস্ত হয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলো। পরবর্তীতে দুর্গেরও পতন হলো এবং বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হলো। দেশের প্রচলিত নিয়ম ও ইসলামের সমরনীতি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হলো।

যুদ্ধের পর একজন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখে আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, কে একে হত্যা করেছে? খালিদ বিন ওয়ালীদের নাম বলা হলো। প্রিয় নবী তাকে তলব করে কঠোর তিরস্কার করলেন এবং বললেন, কোন নারী, শিশু ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা জঘন্য অন্যায়।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখো, অনিবার্য প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করলেও যুদ্ধের মাঠে পর্যন্ত ইসলাম কত উদার ও মানবিক নীতি গ্রহণ করেছে!

এ যুদ্ধের মালে গনীমত বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল আনসারগণের তুলনায় কোরেশের নওমসলিমদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। ফলে এই ভেবে আনসারগণ বিষণ্ন হলেন যে, আপজনদের পেয়ে হয়ত তাদের প্রতি আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসায় ভাটা পড়েছে।

বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের কর্ণগোচর হলে আনসারীদের জমায়েত করে তিনি বললেন—

'তোমাদের কী সব আলোচনা শুনতে পাই!'

আনসারগণ আদবের কারণে নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল নিজে থেকে বললেন—

'আচ্ছা, এটা কি ঠিক নয় যে, তোমরা অন্ধকারে ছিলে, আমি তোমাদের আলোর পথে এনেছি। তোমরা হানাহানিতে লিপ্ত ছিলে, আমি তোমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছি?'

আনসারগণ নতমুখে জবাব দিলেন, 'আল্লাহর রাসূলই অধিক অনুগ্রহকারী!'

প্রিয় নবী কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বন করে বললেন, 'তোমরা অবশ্য বলতে পারতে যে, আপনার যখন কোন আশ্রয় ছিলো না আমরা তখন আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি যখন নিঃসঙ্গ ছিলেন আমরা তখন আপনাকে সাহায্য করেছি।

আচ্ছা, তোমরা কি এতে খুশী নও যে, অন্যরা যখন উট ভেড়া নিয়ে ফিরে যাবে তোমরা তখন আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে মদীনায় ফিরে যাবে।'

আনসারদের মজলিসে তখন কান্নার রোল পড়ে গেলো। তাঁরা বললেন–

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নির্বোধ আমরা, আমাদের ত্রুটি মার্জনা করুন।'

এ যুদ্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, হাওয়াযিন গোত্রের এক প্রতিনিধিদল দরবারে রেসালাতে বন্দীদের মুক্তি দানের আকুল আবেদন জানালো। রহমতের নবী তখন রহমদিল হয়ে বললেন–

'আচ্ছা, নামাযের সময় মসজিদে এসো।'

নামায শেষে আল্লাহর রাসূল ছাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দেখো, হওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তাদের বন্দীদের মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছে। তোমদের সম্পদে আমি কোন হস্তক্ষেপ করতে চাই না, যারা মুক্তিপণ ছাড়া মুক্তি দানে সম্মত আছো তারা তাই করো, আর যারা মুক্তিপণ চাও তাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আগামীতে আল্লাহ যে 'ফায়' দান করবেন তা থেকে আমি মুক্তিপণ পরিশোধ করবো।'

আল্লাহর রাসূলের মনোবাসনা বুঝতে পারামাত্র আশেকানে রাসূল সমস্বরে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মুক্তিপণ ছাড়াই সানন্দে সম্মত আছি।

এভাবে ছয় হাজার গোলাম আযাদ হলো এবং আল্লাহর রাসূলের এই অনন্য সাধারণ মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে হাওয়াযিন গোত্রের প্রায় সকলে ইসলাম গ্রহণ করলো।

***

তাঈ গোত্র এতকাল নীরব ছিলো। আল্লাহর রাসূলও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু এবার তারাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। আল্লাহর রাসূল তাদের শায়েস্তা করার জন্য হযরত আলীর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করলেন।

আরবের স্বনামধন্য দানবীর হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী ছিলেন উক্ত গোত্রের প্রধান। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিনি পলায়ন করলেন। হাতেম তাঈ-এর কন্যা 'সাফফানা'সহ তাঈ গোত্রের বহু লোক বন্দী হলো। হাতিম-কন্যা সাফফানা আল্লাহর রাসূলের দরবারে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন। জাহেলী যুগের যে সকল লোক কাফির মুশরিক অবস্থায়ও দানশীলতা, মহানুভবতা ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আল্লাহর রাসূল প্রশংসা ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হাতেম তাঈয়ের দানশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার কন্যা সাফফানাকে মুক্তি দান করলেন। কিন্তু সাফফানা ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা। তিনি আল্লাহর রাসূলের খেদমতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরয করলেন–

'আত্মীয়-স্বজন সকলেই যেখানে বন্দী সেখানে মুক্তির আনন্দ কোথায়! অপরাধে আমরা সকলে সমান অংশীদার, সুতরাং শাস্তির ক্ষেত্রেও আমি সমান অংশীদার হতে চাই।

হে মুহাম্মদ! আপনি অতি মহানুভব। আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন, 'মুক্তির শাস্তি' না দিয়ে 'বন্দিত্বের অনুগ্রহ' করুন।

হাতেম-কন্যার 'আত্মত্যাগমূলক' বক্তব্যে আল্লাহর রাসূল খুবই প্রীত হলেন এবং সস্নেহে তাকে বললেন–

'তোমার আব্বা ভালো মানুষ ছিলেন, যাও তোমরা সকলেই মুক্ত।'

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল প্রত্যেক গোত্রে একজন শিক্ষক ও প্রচারক প্রেরণ করলেন। নওমুসলিমদেরকে তারা ইসলাম ও ইসলামী চরিত্র শিক্ষাদান করতেন এবং অমুসলিমদেরকে ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত দিতেন। এর ফলাফল হলো অতি শুভ। দশম হিজরী পর্যন্ত আরবের প্রায় সকল গোত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

***

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো। পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলনের লগ্ন সমুপস্থিত হলো। তাই আল্লাহর নবী সমগ্র উম্মতকে একত্র করে শেষ উপদেশ দান করবেন বলে মনস্থির করলেন এবং বিদায় হজ্জের ঘোষণা প্রদান করলেন। সোয়া লাখ ছাহাবীর সমাবেশ হলো মক্কায়।

ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে যে মানুষটি একা দাঁড়িয়ে একদিন সত্যের প্রথম আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারপর মক্কার পথে পথে এবং তায়েফের গলিতে গলিতে লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং হিজরতের সময় তিনদিন গুহায় লুকিয়ে থেকে প্রাণ রক্ষা করেছেন সেই নিঃসঙ্গ মানুষটি আজ প্রাণ উৎসর্গকারী সোয়া লাখ ছাহাবীর বিশাল সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন। আরাফাতের ময়দানে তপ্ত বালুল উপর আগুন ঝরা আসমানের নীচে সকলে দাঁড়িয়ে আছেন। ইহরামের কাফনতুল্য শুভ্র পোষাক সকলের দেহে। আল্লাহর দরবারে শোকর ও রোনাজারির অপূর্ব সূরমুর্ছনা এবং বিনয়কাতর সমধুর প্রার্থনা। আমীর-গরীব ও ইতর-শরীফের কোন তফাত নেই। এক পোষাকে, এক কাতারে একই ধ্যানে নিমগ্ন সকলে। একেই বলে প্রকৃত সাম্য। এ সাম্য এসেছে ইসলামের বরকতে, ঈমান ও তাওহীদের কল্যাণে এবং আল্লাহর রাসূলের পবিত্র সান্নিধ্যগুণে।

প্রিয় নবী তাঁর তেইশ বছরের মেহনত-পরিশ্রম ও সাধনা-মোজাহাদার 'ফসল' নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। তায়েফের মাটিতে রক্ত ঝরানো তাঁর সফল হয়েছে, ওহুদের ময়দানে দান্দান শহীদ করা সার্থক হয়েছে। তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ আজ পরিপূর্ণ, সুপরিণত ও সুবিকশিত। সুতরাং তাঁর পবিত্র হৃদয়ে এখন শান্তি ও প্রশান্তির কী অপূর্ব ভাব ও অনুভূতি

বিদ্যমান তা শুধু তিনিই জানেন। দ্বীনের পরিপূর্ণতা ঘোষণা করে তখন আয়াত নাযিল হলো–

اليوم اكملت لكم دينكم و اتمت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام دينا

'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে আজ পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য অনুমোদন করলাম।'

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা গেলো যে, হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাত এখন সুসমাপ্তির পথে। যে সুমহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিলো তা এখন সুনিষ্পন্ন প্রায়। সুতরাং তাঁর পার্থিব জীবনের সায়াহ্নকাল সমুপস্থিত এবং প্রিয়তম প্রতিপালকের সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুভলগ্ন সমাগত প্রায়। তাই তিনি আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমতে আরোহণ করলেন এবং সমবেত ছাহাবা কেরামকে সম্বোধন করে বললেন–

'হে লোকসকল! হয়ত বা আগামী বছর এমন সময় তোমাদের মাঝে আমি আর থাকবো না। তাই মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো। এই মাস, এই দিন এবং এই শহর তোমাদের পক্ষে যেমন পবিত্র তেমনি তোমাদের জানমাল ও ইজ্জত-আবরু অপরের পক্ষে চিরপবিত্র।'

'মনে রেখো, কেয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, আর তিনি তোমাদের প্রতিটি কর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন।'

'দেখো, তোমাদের স্ত্রীদেরকে তোমরা আল্লাহর নামে গ্রহণ করেছো। সুতরাং তাদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো এবং তাদের প্রতি সুকোমল আচরণ করো।'

বিদায় হজ্জে আল্লাহর রাসূল আরেকটি কথা বলেছেন, তা হলো– আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণ যত কথা বলেছেন, তার মাঝে সর্বোত্তম কথা হলো–

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير.

درندون چرندون کے ہجوم، سُن تو سہی ذرا میری، اے چورون اور ڈاکوٗن کے ماوا، اے رہزنون اور لٹیرون کے مسکن، اے اجڈ گنوارون کے ٹھکانے، اے ازلی بادہ نوشون کے خمخانے، بتا تو مجھے وہ اپنا گنُ، جس سے عالم بھر کو تو نے نیچا دکھایا، کہہ تو اپنی وہ خوبی جس سے تو نے اس خسرو خوبان کو اپنا خواہان بنایا، اے عرب تیرا نام ونشان وہی کسی نے نہ سنا ہوتا نہ تیرا ذکر ہی کسی کے کانٔ تک پہنچا ہوتا، عالم کو علم نہ ہوتا، کہ یہان جنگلون کا داس ہے، یا بنی آدم کی بستی، اراہگیر کا تم سے ایک دفعہ پالا پڑا ہوتا، اسکی جداولاد سے بھی کسی نے پھر تیری طرف رخ نہ کیا ہوتا، اے وحشی عرب، تجھ مین بھرے تھے دنیا کے بدکار اور جگت کے مکار، صرف نام ونشان کے انسان مگر کرتوت کے شیطان، سچ ہے،

چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر اک لوٹ اور مار مین تھا یگانہ
فسادون مین کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ

وہ تھے قتل وغارت مین چالاک ایسے
درندے ہون جنگل مین بیباک جیسے

مگر اے سرزمین عرب، آج وہ دن ہے، کہ تیرا نام وردزبان جہان ہے اور خلق خدا تیرا ذکر خیر کرتی ہے، کونسی آنکھ ہے، جو تیرے درشن کو نہین ترستی، وہ کون نین ہے، جو تیری دید کی تمنا نہین رکھتی، وہ کونسا ملک ہے جس نے تیرے شاہ کا سکہ نہین مانا، اور وہ کون فرمانروا ہے جس نے تیری حشمت اور دبدبہ کو نہین جانا، اے خطۂ عرب تو نے اب پرانا جامہ اتارا، تو نے نیا اوتار دھارا، اے عرب تو نے نیا جنم پایا، جو تجھے رسول خدا ہاتھ آیا، تو فخر دین، تو رشک ملت،

'রাসূলে আরাবী'-এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ফটোকপি।

'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। সব কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।'

***

একাদশ হিজরীতে আল্লাহর রাসূলের বয়স হলো তেষট্টি বছর। তখন মনে হতো, পরম সত্তার সঙ্গে পরম মিলনের পরম মুহূর্তটির জন্য তিনি পরম প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

ইতিমধ্যে অসুস্থতা শুরু হলো, প্রচণ্ড জ্বর ও মাথা ব্যথায় তিনি কাহিল হয়ে পড়লেন, কিন্তু রূহানী শক্তিতে তখনও ছিলেন পূর্ণ বলীয়ান। অসুস্থতার দিনগুলোতেও তাঁর নামায় কাযা হয়নি, বরং মসজিদে তাশরীফ এনে নিয়মিত ইমামতি করেছেন। এমনকি কয়েক ওয়াক্ত দু'জনের কাঁধে ভর দিয়েও মসজিদে এসেছেন। ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে তাও যখন সম্ভব হলো না তখন হযরত আবু বকরকে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। অবশ্য সেদিনও শেষ বারের মতো তিনি জামাতে শরীক হলেন এবং নামায শেষে মিম্বরে বসে সকলকে সম্বোধন করে বললেন−

'হে লোকসকল! যদি তোমাদের কারো প্রতি আমি কোন অবিচার করে থাকি তাহলে আমাকে মাফ করো কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করো যাতে আল্লাহর পাকড়াও হতে আমি রক্ষা পাই। তদ্রূপ যদি কারো কোন হক আদায় না করে থাকি তাহলে এখনো সময় আছে, আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে নাও।'

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, একদিন আপনি আমার কাছ থেকে তিনটি দিরহাম নিয়ে এক প্রার্থীকে দান করেছিলেন, সেটা ফেরত দেয়া হয়নি।

আল্লাহর রাসূল তৎক্ষণাৎ তা আদায় করলেন। মৃত্যু শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে অতিক্ষীণ স্বরে কী যেন বললেন। উপস্থিত ছাহাবা কেরাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমি এখন যে 'ভাব'-এ নিমগ্ন তা তোমাদের জগত হতে উত্তম।

মৃত্যুকালে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলো–

بل الرفيـق الأعـلى

'সর্বোত্তম বন্ধুকে চাই।'

'সর্বোত্তম বন্ধু' তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন এবং তাঁকে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। একাদশ হিজরীর বারই রবিউল আওয়াল মুতাবিক আটই জুন ৬৩২ খৃস্টাব্দে দ্বিপ্রহর কালে আল্লাহর হাবীব আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করলেন। বিশ্ব-বাগানের শ্রেষ্ঠ বুলবুল, বিশ্ব-বিধাতার জয়গানের চিরন্তন ব্যবস্থা রেখে চিরকালের জন্য নীরব হয়ে গেলেন।

আকাশ কাঁদলো, পৃথিবী কাঁদলো। রাতের তারাদের আলো নিভে গেলো, বাগানে ফুলের হাসি মিলিয়ে গেলো। সৃষ্টিজগতের সর্বত্র একই সুর, তিনি নেই, তিনি নেই!

হে আমেনার দুলাল! হে প্রিয়তম মুহাম্মদ! বড় দ্বিধা-সংকোচ ও লাজ-শরম নিয়ে কলম তুলেছি তোমার কথা লিখবো বলে, যদি তাতে মনের বিরহজ্বালার কিঞ্চিৎ উপশম হয়!

কলমের কি সাধ্য তোমার সৌন্দর্য তুলে ধরে! তোমার পূর্ণতার ছবি আঁকে! জানি এ অতি বড় ধৃষ্টতা। কিন্তু এতো জন এতো ক্ষমা পেলো তোমার কাছে, আমি কি পাবো না!

হে প্রিয়তম আহমদ! কখনো অন্য কোন লোকে দেখা যদি হয়, আর আমি যদি আমারই পাপের ভারে ডুবে যাই তখন কি আমাকে তুমি চিনবে না! কাছে টেনে নেবে না! সে আশায় বুক বেঁধে আছি হে প্রিয়তম!

সমাপ্ত

সূচীপত্র

হৃদয়ের আকুতি

সত্যের আলো ছড়াতে, পুণ্যের পথ দেখাতে এক মহামানবের আবির্ভাব হলো। তাঁর শুভদর্শনে দৃষ্টি যাদের প্রেমমুগ্ধ হলো এবং হৃদয় যাদের ভালবাসায় স্নিগ্ধ হলো জনম তাদের সার্থক হলো, জীবন-স্বপ্ন তাদের সফল হলো। এ পরশমণির পরশ-সৌভাগ্য যারা লাভ করলো, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি তারা হলো। এ স্বর্গ-পুষ্পের সান্নিধ্য-সৌরভ যারা পেলো বিশ্ব-বাগানে তারা গোলাবের খোশবু ছড়ালো।

ঊষর মরুর বাসিন্দা হে উম্মি আরব! জানি না; মর্তলোকের মানব, না স্বর্গলোকের দেবতা তোমরা! হাবীবে খোদার দীদার-দর্শন পেলে কোন্ সে মহাগুণে! নূরে খোদার তাজাল্লিতে ধন্য হলে কোন্ সে মহাপুণ্যে!! ইতিহাস তো বলে, লুটতরাজ ও খুনখারাবি ছিলো তোমাদের পেশা, আর নাচ-গান ও মদ-জুয়া ছিলো তোমাদের নেশা। এমন কোন অন্যায় ছিলো না যা তোমরা জানতে না, এমন কোন পাপও ছিলো না যা তোমরা করতে না। 'আকারে ইনসান, প্রকারে শয়তান' এই তো ছিলো তোমাদের 'পহচান'। অথচ সারা বিশ্বে আজ তোমাদেরই জয়গান, তোমাদেরই 'শওকত-শান'!

বলো না কোন্ সে প্রতিভা সুপ্ত ছিলো তোমাদের মাঝে, কোন্ সে অমৃতজলের সন্ধান ছিলো তোমাদের কাছে, যার ফলে তোমাদের জীবনে হলো নবপ্রাণের সঞ্চার এবং চরিত্রে এলো এমন মহাবিপ্লব, সময়ের মুহূর্ত ব্যবধানে 'রাহজান' থেকে হয়ে গেলে রাহবার!

কাফেলা লুণ্ঠনকারী এই তোমাদের কাছেই বিভ্রান্ত মানব-কাফেলা পথের দিশা পেলো! মুক্তির মহাসড়কে পথচলা শিখলো! মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়ও যে হার মানে তোমাদের কাছে!

হে বালুসাগরের 'আরবিস্তান'! বিশ্বমানচিত্রে একদা তুমি এমনই অখ্যাত অবজ্ঞাত ছিলে যে, সভ্য জগত জানতো না, আরব নামের কোন দেশ আছে, আর সেখানে মানুষের সমাবেশ আছে, অথচ বিশ্ব-জাতি আজ তাকিয়ে আছে তোমার পানে কী বিপুল বিস্ময় নিয়ে! তোমার প্রেমে কাতর নয় কোন্ সে মন! তোমার দর্শন-পিপাসু নয় কোন্ সে নয়ন! এবং তোমার আশীর্বাদের ভিখারী নয় কোন্ সে রাজা! কোন্ সে রাজ্য!

হাবীবে খোদার পদধূলি, নূরে খোদার তাজাল্লি তোমাকে দিয়েছে নবজীবনের নবসাজ। তাই মানবসভ্যতার মুকুট তুমি আজ। সর্বদেশের ঈর্ষা, সর্বজাতির শ্রদ্ধা এখন লুটিয়ে পড়ে তোমারই পায়ে, সুতরাং গর্ব করা তোমাকেই সাজে, মান করা তোমাকেই শোভে।

কী আর বলতে পারি বঞ্চিত এই আমরা! ভগবানের লীলা যে চিররহস্যঘেরা! কে জানে কখন কাকে সিক্ত করে তাঁর করুণাধারা। তাই তো আহমদী নূরের সওগাতে ধন্য হলে তুমি! মুহাম্মদী নবুয়তের অরুণালোকে স্নাত হলো তোমার বালুভূমি। অথচ বঞ্চিত হলো স্বর্ণপ্রসবা ভারতভূমি! গঙ্গা-হিমালয়ের এই ভারতভূমি!

অজেয় হিমালয়ের তুষারশুভ্র হে গর্বিত চূড়া! তুমিই বলো না, কতশত ঋষির ধ্যানমগ্ন রজনী প্রভাত হয়েছে তোমার কোলে! কত সাধু, কত সাধক সিদ্ধি লাভ করেছে তোমার প্রেম-সরোবরে অবগাহন করে, তোমার হিমশীতল চরণে প্রাণ উৎসর্গ করে! কিন্তু বলো, সত্যি করে বলো; মরুমক্কার এতীম দুলালের সেই মোহিনী রূপ কখনো দেখেছো তুমি! প্রিয় মদীনার প্রিয়তমের সেই নূরানী দীপ্তি কোথাও নজরে পড়েছে তোমার! তাই বলি, কী আছে তোমার মাথা উঁচিয়ে গর্ব করার!

মহাকালের স্রোতপ্রবাহের নীরব সাক্ষী হে গঙ্গা! তোমার তরঙ্গছন্দে বিমুগ্ধ কত ভক্ত পূজারী গঙ্গামন্ত্রযোগে প্রণাম করেছে তোমাকে। তাদের প্রেমতপ্ত হৃদয় শান্ত শীতল হয়েছে তোমারই পবিত্র জলে। কিন্তু বলো, সত্যি করে বলো; মরুমক্কার আবে-জমজম অধিপতি একবারও কি দাঁড়িয়েছিলেন তোমার তীরে এসে! আঁজলা ভরে জল কি পান করেছিলেন তোমার বুকে নেমে!

হে দিল্লীভূমি! সেই 'আকবরের' দেখা কি পেয়েছিলে তুমি! হে ময়ূর

সিংহাসন! তোমাকে ধন্য করেছিলো কি সেই 'শাহজাহানের' পদধূলি!

হে দুর্ভাগিনী ভারতমাতা! ভগবানের অকৃপণ দানে, অশেষ আশীর্বাদে তুমি ধন্য, হিমালয় তোমার গর্ব; আগ্রা, দিল্লী, আজমীর ও মুলতান তোমার গৌরব। ভগবানের অশেষ কৃপায় ধনে, জনে, সম্পদে, গর্বে কোন কিছুতেই অপূর্ণতা নেই তোমার। কিন্তু মক্কা-মদীনার গৌরব তুমি পেলে না! জাবালে নূরের ঐশী নূর তো ভগবান তোমায় দিলেন না! ইসলাম ও মানবতার কাবা-কেবলা তো তোমার ভাগ্যে জুটলো না!

দুর্ভাগিনী ভারতমাতা! সে জন্য দুঃখ করো না, চোখের জলে বুক ভাসিও না। অশ্রুসাগর পাড়ি দিলে বিরহ-বঞ্চনার যদি অবসান হতো, কান্নার ভেলায় হাজার বছর না হয় ভেসে বেড়াতাম। কিন্তু ভগবানের দান তো সম্পদে কেনা যায় না, ছিনিয়েও আনা যায় না। নইলে তোমার 'সুপুত্ররা' বিশ্বের সম্পদভাণ্ডার লুটিয়ে দিতো তোমার চরণতলে। এ অমূল্য হার যে কোন মূল্যে পরাতো তোমার কণ্ঠে। কিন্তু তা যে হবার নয়! ভগবানই শুধু জানেন, কাকে তিনি কৃপা করেন। তাই ভগবানের বিচার মেনে ধৈর্য না ধরে উপায় কি বলো! ত্যাগ ও প্রেমই তো তোমার ধর্ম। শান্তি ও অহিংসাই তো তোমার বৈশিষ্ট্য। এতো উতলা হওয়া কি তোমাকে সাজে?

দুর্ভাগিনী ভারতমাতা! হয়ত বলবে, আমাকে উপদেশ দিতে এসো না। যুগে যুগে কত দুর্যোগ গেলো আমার উপর দিয়ে, আঘাতে আঘাতে কত রক্ত ঝরলো আমার বুক থেকে। তখন ধৈর্য ধরিনি আমি! বুক ফেটেছে তবু তো আমার মুখ ফুটেনি। ধৈর্যের দুর্গম পথে হাজারো চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়েই তো ইতিহাসের একেকটি ধাপ অতিক্রম করেছি আমি। কিন্তু এ তো ধৈর্য বা ঔদার্যের প্রশ্ন নয়, এ যে গৌরব ও মর্যাদার প্রশ্ন! এ বঞ্চনা কি করে সইবো বলো? মর্যাদার প্রশ্নে তো আপন অস্তিত্বকেও আমি বিসর্জন দিতে রাজী। হিমালয়কে ডিঙ্গিয়ে আরবের আল হেরা লুফে নেবে ভগবানের এ মহাদান, চোখ বুজে তা কি সহ্য করা সম্ভব কখনো!

***

হে দয়ার নবী রাসূলে আরাবী! আপনার পবিত্র হাতেই সঁপে দিলাম

বিচারের ভার। দুর্ভাগিনী ভারতমাতাকে আপনিই সান্ত্বনা দান করুন। তার অভাগা সন্তানদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।

হে আহমদ! তোমার প্রেমে এ অধম হিন্দুস্তানীর কোমল হৃদয় যে ক্ষত-বিক্ষত! অনুগ্রহ করে তাতে সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলাতে এসো না প্রিয়তম! চৌদ্দশ বছর সাক্ষী! কোন ইউসুফ কোন মিসরে তোমার মতো প্রেম-সমাদর পায়নি। কেননা, তোমাতেই শুধু ঘটেছে বিধাতার অপরূপ রূপমহিমার অপূর্ব প্রকাশ। তাই হাজার বছরের ব্যবধানেও কোন পাষাণ এড়াতে পারে না তোমার স্বর্গীয় জ্যোতির্ময়তার হাতছানি।

প্রিয়তম! তোমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভে না হয় বঞ্চিত হলাম, তাই বলে স্বপ্নের বাতায়ন পথেও কি একবার নসীব হতে পারে না তোমার দীদার!

হে মুহাম্মদ! তোমার দর্শন-সৌভাগ্য একবার যে লাভ করেছে, শুনেছি হৃদয় তার তোমাতেই চিরসমর্পিত হয়েছে। চোখে তোমার প্রেমের সুরমা একবার যে মেখেছে স্বর্গ-মর্তের সকল সৌন্দর্যের মোহ থেকে তার চিরমুক্তি ঘটেছে। পাথরও নাকি সোনা হতো তোমার পরশগুণে। পাষাণ হৃদয়ও নাকি মোম হতো তোমার 'দৃষ্টি' পেয়ে। তাহলে এদিকে হোক না একবার সে করুণাদৃষ্টি! তোমার নূর তাজাল্লির একটুখানি 'প্রসাদ' লাভের আশায় দুয়ারে তোমার হাত পেতেছে হিন্দুস্তানী এ ভিখারী। দোহাই তোমার প্রেমের! বঞ্চনার দহনে আর দগ্ধ করো না এ অভাগাকে!

স্বীকার করি; মহামহিমের স্তুতি-ধন্য তুমি, জগদীশ্বরের প্রেমাস্পদ তুমি, কিন্তু আমিও যে তোমার কৃতার্থ দাস!

প্রিয়তম! সেবাদাসত্বের সৌভাগ্য-তিলকও যদি ললাটে না জোটে, তাহলে মুহূর্তের জন্য হলেও একবার এসে বলে যাও, তুমিও কি মেনে চলো আপনপরের পার্থক্য! নইলে কেন এ উপেক্ষা! কিসের এ পর্দা!

তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আকুতি শোনো প্রিয়তম! এসো হে প্রিয়তম! তোমারই জন্য যে সাজিয়েছি আমার এ হৃদয়-সিংহাসন!

প্রথম অধ্যায়

আরবে প্রত্যেক গোত্রের ছিলো স্বতন্ত্র বসবাস। কেননা আরব হলো মুরুভূমি ও পাহাড়-পর্বতের দেশ। বিরাট জনবসতি, কিংবা শহর-নগর গড়ে ওঠা তাই সম্ভব ছিলো না সেখানে। এমন কি সাধারণ লোকালয় গড়ে ওঠাও ছিলো অসম্ভব। কোথাও একটু পানির খোঁজ, কিংবা সবুজের সামান্য আভাস পাওয়া গেলে সেখানেই তাঁবু টানিয়ে নেমে পড়তো 'মরুভূমির জাহাজে' ভেসে বেড়ানো পুরো দল। এভাবে গড়ে উঠতো ক্ষুদ্র একটি বস্তি, যার স্থায়িত্ব নির্ভর করতো পানি ও সবুজ ঘাসের উপর। মক্কাবাসীদের এই ছিলো জীবনধারা। আশপাশের বস্তিগুলোরও ছিলো একই অবস্থা।

নিয়মতান্ত্রিক কোন রাজা বা রাজ্য ছিলো না মক্কায়। বড় বড় গোত্র থেকে দশ সদস্যের নির্বাচিত পঞ্চায়েতই স্থানীয় বিচার ও শাসন পরিচালনা করতো। পবিত্র কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়কও নিযুক্ত হতো তাদের মধ্য থেকে। দীর্ঘকাল ধরে বহাল ছিলো এ আন্তগোত্রীয় ব্যবস্থা, যা মক্কাবাসীদের কাছে অলিখিত বিধানের মর্যাদা লাভ করেছিলো।

এর মধ্যে মক্কায় একবার বাইরের হানাদার বাহিনীর হামলা হলো। হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রপিতামহ হাশিম তাদের সফল মোকাবেলা করলেন এবং বিপর্যস্ত হানাদার বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। মহাসংকটকালের এই বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকার মাধ্যমে হাশিম গোত্রীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং মক্কায় তাঁর একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এমন কি মক্কাবাসীদের কাছে হাশেমীদের এ অনন্য মর্যাদা উত্তরাধিকার-স্বীকৃতি লাভ করেছিলো।

হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ চব্বিশ বছর বয়সে বিবি আমেনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আরবের অভিজাত গোত্রের অভিজাততম হাশেমী পরিবারের এ

বিবাহ বেশ ধূমধামের সাথেই সম্পন্ন হলো। গুণ ও চরিত্র মাধুর্যে বিবি আমেনা ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত নারীসমাজের আদর্শ। স্বর্গীয় সৌন্দর্যের এক জ্যোতির্বলয় বিরাজমান ছিলো তাঁকে ঘিরে। তাই ছোট বড় সকলেই সশ্রদ্ধ সম্বোধন করতো তাঁকে। এক অনাবিল দাম্পত্য সুখের মাঝে উভয়ের দিন গুজরান হতে লাগলো। কিন্তু নিয়তি বড় নির্মম! সুখ ও শান্তির নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ দিতে রাজী নয় কাউকে সে। তাই সুখের পায়রা ডানা মেলতে না মেলতেই নির্মম নিয়তির এক ঝাপটায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মাটিতে। দুঃখের কালো ছায়া নেমে এলো বিবি আমেনার 'কুসুম-উদ্গাত' জীবনে। স্বামী আব্দুল্লাহ ব্যবসা উপলক্ষে সফরে বের হলেন। কিন্তু ফিরতি পথে মদীনায় পৌঁছে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, প্রাণসংশয় দেখা দিলো এবং সত্যি সত্যি তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এলো। আর সব মানুষের মতো তাঁকেও সাড়া দিতে হলো পরপারের ডাকে। মাত্র পঁচিশ বছরের তাজা যুবক আব্দুল্লাহ তখন। বিধাতার কী রহস্য-লীলা! স্বপ্নের পুষ্পকলি প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই বিদায় নিলেন আমেনার 'জীবনমালঞ্চের মালাকর'।

হায় আব্দুল্লাহ! আগামীকাল যার শুভাগমনে ধন্য হবে মানবসমাজ, ধন্য হবে বিশ্বজগত, তাঁর পিতৃত্বের মহাগৌরব ললাটে ধারণ করেও চোখ জুড়িয়ে একটিবার দেখে যাওয়া হলো না তাঁকে। আবদুল্লাহ কি জানতেন যে, বিবি আমেনার গর্ভে তাঁর রেখে যাওয়া 'অংকুর' সুশীতল ছায়ার মহাবৃক্ষ হবে একদিন, অশান্ত মানবতা যাঁর আশ্রয়ে ছুটে আসবে শান্তির সন্ধানে, মহামুক্তির আকুতি নিয়ে! হায় আফসোস, যে গৃহকোণ থেকে উৎসারিত হবে 'সত্য-জলের পবিত্র গঙ্গা' এবং নিবারিত হবে লক্ষ কোটি তৃষ্ণার্ত আত্মার মহাসত্যসন্ধানের তৃষ্ণা, সে গৃহের গৃহী নিজে বিদায় হলেন আত্মার অনন্ত পিপাসার অসীম বেদনা নিয়ে!

অকাল 'বৈধব্যের চিতায়' দগ্ধ বিবি আমেনার শোকাহত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, সে তো স্বাভাবিক, কিন্তু শতবর্ষের প্রান্তসীমায় পুত্রশোকে আবদুল মুত্তালিবের করুণ অবস্থা ছিলো বর্ণনাতীত। সবার ছোট হলেও আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁর প্রিয়তম পুত্র। সুতরাং এমন পুত্রশোক যার কলিজায় বিঁধেছে তার পক্ষেই শুধু সম্ভব এর গভীরতা অনুভব করা।

নির্জন মরুভূমিতে আবদুল মুত্তালিব যখন রাতের তারাভরা আসমানে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন তখন হয়ত তিনি আসমানে যিনি আছেন নীরব ভাষায় তাঁকে বলতেন–

‘বুড়ো বাবার কলজেপোড়া গন্ধ কি তোমার এতই ভালো লাগে হে জগত-নিয়ন্তা! নইলে তরতাজা পুত্রকে আমার কেন ছিনিয়ে নিলে এমন বয়সে, এমনভাবে! তার আগে যদি আমাকে তুলে নিতে তাহলে তো পুত্রশোকের এ নরকযন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হতো না। আর তো পারি না প্রভো! এবার সাঙ্গ করো তোমার এ কৌতুক-লীলা, নিভিয়ে দাও আমার জীবনপ্রদীপের এ নিভু নিভু শিখা।’

কিংবা হয়ত তাঁর অনুযোগ ছিলো আরো করুণ, আরো মর্মস্পর্শী, যা প্রকাশ করার ‘যথাশব্দ’ মানুষের ভাষায় আজো তৈরী হয়নি। তাই শুধু প্রার্থনা করি, হে বিধাতা! এমন পুত্রশোক কোন কালে, কোন দেশে, কোন মানুষকে আর দিও না তুমি।

একদিকে ছিলো বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবের এমন করুণ অবস্থা, অন্যদিকে বিধাতার ইঙ্গিতে ফিরেশতালোক থেকে যেন ভেসে আসছিলো এই সুমধুর সান্ত্বনাবাণী–

‘শান্ত হও বৃদ্ধ! শান্ত হও। বিধাতার অসীম করুণা সম্পর্কে কেন তোমার এত নিরাশা! কেন এমন ধৈর্যচ্যুতি! কত বড় সৌভাগ্য তোমার অপেক্ষায় রয়েছে জানো তা! অন্তর্দৃষ্টি মেলে দেখো, ললাটে তোমার এক অক্ষয় তিলক এঁকে দেয়ার জন্য ভগবানের কৃপায় কী বিপুল আয়োজন চলছে স্বর্গরাজ্যে! যে নূরের রোশনিতে দূর হবে গোটা আরবের অন্ধকার, তোমারই ঘরে যে হবে সে নূরের প্রথম উদ্ভাস! পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে সুদূর ভারতভূমিকেও আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেবে যে নও হেলাল, তার শুভোদয়-লগ্ন যে সমুপস্থিত! যে মুক্তিদূতের আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে বিশ্বজগত, তিনি যে তোমারই ঘরে আসছেন ‘শিশু জাদুকর’ হয়ে! যে মুআজ্জিনের কণ্ঠ-বাণী সাফা পাহাড়ের চূড়া থেকে হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হবে, তিনি যে তোমারই বংশধর! যাঁর পবিত্র নামের নূরনূরানিয়াতে তোমারও নাম হবে চিরউজ্জ্বল, চিরঅমর, তিনি যে আসছেন তোমারই ঘরে, তোমার পুত্রবধুর কোলে! এ মহাসৌভাগ্যের

বিনিময়ে পুত্রশোকের ক্ষুদ্র কোরবানীতে কেন তোমার এতো কুণ্ঠা, এতো অনুযোগ!'

সূরাতুল 'বাকারাহ'র পনেরতম রুকুতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এরূপ দু'আ বর্ণিত হয়েছে–

'হে আমার প্রতিপালক! মক্কাবাসীদের মাঝে তাদেরই একজনকে নবীরূপে প্রেরণ করুন।'

'সূরাতুস-সাফ' এর পথম রুকুতেও অনুরূপ দু'আর উল্লেখ রয়েছে। বাইবেল যোহনের এক অধ্যায়ে হযরত ঈসা (আঃ)ও স্বজাতিকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন–

'আমার পর এক নবীর আবির্ভাব হবে যাঁর নাম হবে আহমদ।'

স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

'আমি হলাম দাদা ইবরাহীমের দু'আ এবং ভাই ঈসার সুসংবাদ।'

***

অবশেষে প্রতিশ্রুত শুভলগ্ন সমুপস্থিত হলো। সে সূর্যের উদয় হলো যাঁর স্বর্ণ-কিরণে পৃথিবী ঝলমল করে উঠলো, কিংবা বলো; সে চাঁদের উদয় হলো যাঁর স্নিগ্ধ জোছনায় পৃথিবী স্নাত হলো, জগতের আঁধার দূর হলো। বিবি আমেনার কোল জুড়ে এলো এক পুত্রসন্তান। এমন 'সুপুত্র', যাঁর আগমন-পুলকে আরশ-জমিন পুলকিত হলো। সৃষ্টির প্রতিটি কণা হলো উদ্ভাসিত।

সৃষ্টিকর্তা কতবার তাঁর সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন! রূপের কত অপরূপ আধার তৈরী করেছেন! কত বিচিত্র সুন্দরের প্রকাশ ঘটিয়েছেন! কিন্তু এবার তিনি রূপ ও সৌন্দর্যের এবং গুণ ও মহিমার যে সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটালেন তার কল্যাণ-উদ্ভাসে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য যেন নব উজ্জ্বলতা লাভ করলো, স্নিগ্ধতার নতুন ছোঁয়া পেলো। পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব পৌত্রের জন্মসুসংবাদে যেন নবজীবন লাভ করলেন। বিবি আমেনার কোল আলো করা শিশুর চাঁদমুখ দেখে খুশির

আলো নেমে এলো শতবর্ষের বৃদ্ধের 'নিষ্প্রভ' চোখে। আহা, কেমন মায়া মায়া চাহনি! সারা মুখে নূরের কী অপূর্ব দীপ্তি! কেমন আদরকাড়া হাসি! আব্দুল মুত্তালিব চেয়ে চেয়ে দেখেন, তবু যেন আশা মেটে না। কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরেন, তবু যেন তৃষ্ণা কাটে না। বুকের পুঞ্জীভূত শোক আনন্দের বারিধারায় যেন ধুয়ে মুছে গেলো। পুত্রের মৃত্যুতে হৃদয়ের গভীরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিলো, পৌত্রের জন্মলাভে তাতে যেন সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ পড়লো। দুঃখের শুকনো ডালে সুখের কলি যেন হেসে উঠলো। শতায়ু বৃদ্ধের জরাজীর্ণ মুখমণ্ডলে হঠাৎ যেন বিগত তারুণ্যের সজীব উদ্ভাস খেলে গেলো।

পৌত্রের মুখে তিনি হারানো পুত্রের মুখের আদল দেখতে পেলেন। তার মনে হলো, পরপারের যুবক আবদুল্লাহ বুঝি শিশুরূপে নবজন্ম লাভ করেছে। বেচারা কি করে জানবে যে, তাঁর গৃহে যে নবঅতিথির শুভাগমন, তিনি তো সৃষ্টিজগতের মধ্যমণি! তাঁর নামের মহিমা কীর্তিত হবে একদিন পৃথিবীর কোণে কোণে! তাঁর গুণ-কীর্তির দীপশিখা আলো ছড়াবে পূবে, পশ্চিমে, মানুষের বসতি যেখানে যেখানে!

এতদিন বিধবা আমেনা যেন ছিলেন শোকের জীবন্ত প্রতিমা। তাঁর দিন ও রাত বয়ে চলেছিলো দুঃখের ভেলায়, অশ্রুর নোনা দরিয়ায়। মুখে হাসি নেই, শুধু বিষাদের ছায়া। কারো সঙ্গে কথা নেই, শুধু বেদনার নীরবতা। এমন কি প্রিয় সঙ্গিনীদের উপস্থিতিও মনে হতো যন্ত্রণাদায়ক। নিঃসঙ্গতাই ছিলো তাঁর প্রিয়সঙ্গী। এ অবস্থায় কে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে! কী সান্ত্বনাই বা দেবে! কে তাঁর মনোরঞ্জন করবে! কিভাবেই বা করবে!

কিন্তু এবার মা আমেনার ঝিমিয়ে পড়া জীবনে যেন নতুন ছন্দ এলো, অশ্রু-ঝাপসা চোখের আলো যেন আবার ফিরে এলো। 'শিশু জাদুকর' যেন তাঁর কচি হাতে মায়ের বিষণ্ন, বিবর্ণ মুখমণ্ডলে দুঃখের ছায়া মুছে সুখের আভা ছড়িয়ে দিলো। বেঁচে থেকেও এতদিন তিনি মৃত্যুর কালো চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোল আলো করা পুত্রের শুভাগমনে জীবন ও জগতের সাথে বুঝি নতুন এক যোগসূত্র তিনি খুঁজে পেলেন। ইতিপূর্বে তাঁর দিন-রাত ছিলো বেদনা ও বিষণ্নতার, কিন্তু এখন অশরীরী কারা যেন তাঁকে ঘিরে সুখের চামর দোলা দেয়। এখন তাঁর দিন হলো আনন্দের,

আর রাত হলো প্রশান্তির। তৃষ্ণার্ত চোখে মা আমেনা কোলের শিশুকে বারবার দেখেন। যত দেখেন ততই যেন তৃষ্ণা বাড়ে। শিশুর চোখের অবাক চাহনি মায়ের মনে কত যে সাধ জাগায়! ইচ্ছে হয়, এ শান্তিদূতের শুভকামনায় প্রাণ উৎসর্গ করেন, বুক উজাড় করে সব মমতা ঢেলে দেন। প্রতিবেশিনীরা দলে দলে শিশু মুহাম্মদকে দেখতে আসে। তাদের অভিভূত চিত্ত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে তিনি তুলে ধরেন পুত্রের অতুলনীয় রূপসৌন্দর্যের কথা। বলেন–

বাছা আমার সাত রাজার ধন। মুখের লালা যেন মধু (কিংবা অমৃতজল)। 'অবশ' চাহনিতে যেন মন বিবশ করা জাদু-আকর্ষণ। এই শিশু আহমদের আগমনসুসংবাদই তো পেয়েছিলাম স্বপ্নযোগে ফেরেশতাদের কাছে!'

বিবি আমেনার সুখে আপন-পর সকলেই যেন সুখী। একবাক্যে সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে–

'সার্থক তোমার গর্ভধারণ! ধন্য তোমার মাতৃত্ব! মুহাম্মদ তোমার চিরসুখী হোক! যৌবন তার অক্ষয় হোক! জীবন তার চিরবসন্ত হোক! মধ্যগগনে সৌভাগ্য-তারকা তাঁর সদা জ্বলজ্বল করুক। আহা! চাঁদমুখে তাঁর কী জোছনামাখা হাসি! কেমন মায়া মায়া চাহনি!

***

নবজাতককে কোলে করে কাবাঘর তাওয়াফ করানো ছিলো আরবের প্রচলিত সংস্কার। সেই গোত্রীয় সংস্কার অনুসরণ করে আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদকে কোলে করে কাবাচত্বরে উপস্থিত হলেন। তাওয়াফ শেষ করে কাবার প্রতিমাদের উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানালেন এবং উদ্বেলিত হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা ও মিনতি জানালেন–[১]

'কাবামন্দিরের হে পাষাণদেবতা! পুত্রের গৃহে পুত্র-সন্তানের আবির্ভাবে ভাঙ্গা কপাল আমার জোড়া লেগেছে আবার। তোমার খেয়ালিপনায় ও

১. এটা লেখকের নিজস্ব সংস্কারপ্রসূত ভাবনা। সীরাতগ্রন্থগুলো স্পষ্ট বলেছে যে, মূর্তি পূজার কলংক থেকে আব্দুল মুত্তালিব সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। –অনুবাদক

কৌতুকলীলায় নতুন কোন ভাঙ্গনের ডাক যেন না আসে। হে পাষাণপ্রতিমা! 'নবপুত্র'কে আমার দীর্ঘজীবী করো, চিরসুখী করো।

আফসোস, বৃদ্ধ যদি অন্তর্চক্ষুর অধিকারী হতেন তাহলে অবশ্যই দেখতে পেতেন, যে শিশুর জন্য তার এ সকাতর প্রার্থনা তাঁরই ভয়ে পাষাণপ্রতিমারা তখন কম্পমান। কেননা তাঁরই হাতে যে পৌত্তলিকতার ধর্মরাজ্যের বিনাশ হবে আগামী দিন!

আল্লাহর কী লীলাখেলা! এই জ্ঞানবৃদ্ধের একশটা বছর কেটে গেলো মূর্তিপূজার অন্ধকারে। ভক্ত পূজারীদের কাতারে দাঁড়িয়ে আজীবন তিনিও পূজা-প্রণাম করে গেলেন ভক্তিবিগলিত চিত্তে। কিন্তু অন্তরে তার এ প্রশ্ন একবারও উঁকি দিলো না যে, এ পথে কেউ কি তার আত্মার প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে? প্রতিমার চরণতলে মাথা কুটে কেউ কি সিদ্ধি লাভ করেছে? পাষাণপ্রতিমা কি হতে পারে মানবের কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ন্তা?

শতবর্ষের জ্ঞানবৃদ্ধের কী আশ্চর্য সরল বিশ্বাস! কিন্তু পাষাণপ্রতিমা কি কখনো কারো বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছে, না সে ক্ষমতা তাদের আছে! প্রতিমার বেদিমূলে ধন-জন ও প্রাণ-মন সর্বস্ব বিসর্জন দিলেও একটি বারের জন্যও তো কৃতার্থ পূজারীর পানে চোখ মেলে চাওয়ার মর্জি করে না তারা। কিন্তু সরল বৃদ্ধকে এ সরল কথাটা বোঝাবে কে? মূর্তিপ্রেমের প্রতিষেধক তাকে বাতলাবে কে! এ সর্পদংশনের 'রক্ষামন্ত্র' জানেন পরম প্রাজ্ঞ যে ওঝা, তিনি তো তখনো ছোট্ট শিশু! তারই কোলে দোল খাওয়া এতীম শিশু!

যাই হোক, মূর্তিপূজক বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মূর্তিত্রাস শিশুকেই মূর্তিগুলোর চারপাশে প্রদক্ষিণ করালেন। নিজেও ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণতি জানালেন। এভাবে সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে শিশুকে ঘরে মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনলেন। ক'দিন পর এক অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিবারের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে শিশুর নাম রাখা হলো 'মুহাম্মদ' যা মূর্তিপূজক আরবদের কাছে ছিলো অশ্রুতপূর্ব। যে শুনলো তার কাছেই বড় সুন্দর ও শ্রুতিমধুর মনে হলো এ নাম। কিন্তু সবার চোখে মুখে যেন নীরব জিজ্ঞাসা, আমেনার শিশুপুত্রের জন্য যে নামের আজ আত্মপ্রকাশ হলো এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলো তা! আরবের বুকে এ নাম তো কেউ

কোন দিন শুনেনি! কোন্ সমাসন্ন সত্যের ইঙ্গিত বহন করে এ নামের আত্মপ্রকাশ!

***

শিশু মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকদিন মাত্র মা আমেনার দুধ পান করলেন। তারপর আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে সোপর্দ করা হলো তায়েফবাসিনী দুধমা হালিমার হাতে। একে একে চার বছর তিনি বিবি হালিমার কোলে তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হলেন। বছরে দু'বার বিবি হালিমা শিশু মুহাম্মদকে মা আমেনার কাছে নিয়ে আসতেন। বুকের মানিককে দু'দিনের জন্য হলেও বুকের মাঝে ফিরে পেয়ে অপরিসীম আনন্দে তিনি নতুন সজীবতা লাভ করতেন। মা আমেনা বলতেন, চাঁদমণি আমার সব দুঃখ মুছে দিয়েছে! আমার আঁধার হৃদয়ে আশার রোশনি জ্বেলেছে!

কিন্তু তুমি কি জানতে মা আমেনা! তোমার চাঁদমণি একদিন পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়-রাজ্যের ঘোর অন্ধকার দূর করে হেদায়াতের আলো ছড়াবেন! সে আলোর ইশারায় শুরু হবে হেরার 'রাজতোরণ' পানে মানবতার পথ ভোলা কাফেলার নতুন সফর!

সাধারণ অবস্থায় দুধ-মাতার কোলে অভিজাত আরবশিশুদের প্রতিপালন দু'বছরের বেশী হতো না। কিন্তু বিবি আমেনা অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে দু'বছরের পরিবর্তে চার বছর আপন শিশুপুত্রকে দুধ-মাতার তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন, যেন শহরের নোংরামি থেকে দূরে, পল্লীর স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশে তাঁর হৃদয়-বাগিচার সবুজ চারাটি বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং দেহ ও মন যেন তাঁর সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত থাকে।

মা আমেনার জীবনে এ ছিলো এক মহাঅগ্নি পরীক্ষা। মুখের কথা আর বাস্তবতার মাঝে ব্যবধান অনেক। সদ্যবৈধব্যের শোকাঘাতে বিপর্যস্ত অল্প বয়স্কা কোন নারীর পক্ষে সুদীর্ঘ চার বছরের জন্য বুকের একমাত্র মানিকের বিচ্ছেদ বরণ করে নেয়া সত্যি এক অনন্যসাধারণ ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচায়ক। পুত্রের কল্যাণ-উদ্দেশ্যে পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনা – যত মর্মন্তুদই হোক – বরণ করার মহৎ চিন্তা এমন কল্যাণীয়া জননীর

পক্ষেই শুধু সম্ভব, ভগবান যাঁকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অনুবর্তীরূপে অতুলনীয় ধৈর্য ও স্থৈর্য দান করেছেন। মা আমেনার এ অনুপম আত্মত্যাগ সার্থক হলো। আরব-পল্লীর সুনির্মল পরিবেশে শিশু মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অটুট স্বাস্থ্য ও অটল চরিত্রের এমন পরিপূর্ণ মানবরূপে গড়ে উঠলেন যে, বিশ্বমানবতার চিরন্তন কল্যাণে নিবেদিত তাঁর পরবর্তী জীবনে শোক-সন্তাপ ও বিপদ-দুর্যোগের যত ঝড় ঝাপটা এসেছে, নিঃশংক চিত্তে তিনি তার মোকাবেলা করেছেন এবং সফলতার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়েছেন। কোন অবসাদ ও দুর্বলতা, কোন পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা তাঁর দেহে বা মনে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারেনি। তাই বিশ্বমানবতা বিশ্বনবীর নিকট যেমন, তেমনি নবী-জননীর নিকটও সমান ঋণী।

কিন্তু হায়! জনম দুঃখিনী মা তাঁর আত্মত্যাগসিঞ্চিত পুষ্পের সৌরভ নিজে কিন্তু পেলেন না। জননী ও পুত্রের 'পুনর্মিলন' দু'বছরের বেশী স্থায়ী হলো না। নির্মম নিয়তি উভয়ের মাঝে মৃত্যুর পর্দা টেনে দিলো। পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে চিরবিদায় নিলেন মা আমেনা, জনম দুঃখিনী মা আমেনা। হে ভগবান! এবার যেন তাঁর দুঃখের ভেলা তোমার করুণা-কূলে চিরস্থির হয়।

প্রিয় স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন মা আমেনা পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে ইয়াছরিব। এক মাস পর ইয়াছরিব থেকে ফেরার পথে 'আরওয়া' নামক নির্জন মরুভূমিতে তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হলো। কী হৃদয়বিদারক দৃশ্য এ! মরুভূমির বালুশয্যায় শুয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর মা অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে আছেন বুকের মানিকের দিকে। সে নিষ্পলক দৃষ্টির অভিব্যক্তি যেন এই–

'আমার বিদায়লগ্ন যে এসে গেলো! পিতার স্নেহ-ছায়া তো আগেই তুলে নিয়েছেন বিধাতা। মাতৃ মমতার সুশীতল পরশ হতেও এবার বুকের মানিক আমার চিরবঞ্চিত হবে। এখন কার হাতে তুলে দিয়ে যাই আমার সাত রাজার ধন!

হে রাব্বুল কাবা! যার কেউ নেই তার আছো তুমি! সুতরাং তুমি তার চিরসহায় হও। যেখানে আমাকে নিয়ে চলেছো সেখানে আমার বুকের মানিক আবার আমাকে ফিরিয়ে দিও।'

অশ্রুসজল চোখের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে শেষবারের মতো মা তাঁর বুকের মানিককে মমতার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মরণযন্ত্রণার তীব্রতায় সে দৃষ্টিও এক সময় ঝাপসা হয়ে এলো। বুকের মানিক যেন ধীরে ধীরে দূরে, বহু দূরে সরে গেলো।

শিশু মুহাম্মদের অবস্থাও ছিলো বড় মর্মস্পর্শী। ফুলের পাপড়ির মতো কোমল নিষ্পাপ মুখে বিষাদের কালো ছায়া। আজন্ম পিতৃহীন এতীম শিশু মাতৃমমতার সুমধুর স্বাদ সবেমাত্র পেতে শুরু করেছেন। কিন্তু হায়, কোন্ অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো মমতাময়ী মা! বিধাতার এ কোন লীলাখেলা!

মরুভূমির নিঃসঙ্গতায় মা আমেনার মৃত্যুর ঘটনায় সেদিন শিশু মুহাম্মদের কচি হৃদয়ে কী অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তাঁর চোখের সাগরে অশ্রুর কেমন জোয়ার এসেছিলো তা জানেন শুধু তিনি, হৃদয় ও হৃদয়ের অনুভূতি এবং চোখ ও চোখের অশ্রু যাঁর সৃষ্টি, বিশ্বজগতের সকল গতি ও স্থিতি সম্পর্কে যাঁর পূর্ণ অবগতি।

প্রকৃতির কী রহস্য, জানি না। বিপদ যখন আসে, একা আসে না। শিশু মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। যদিও দু'বছর আট মাস দশ দিন পার হয়ে গেছে, তবু মায়ের মৃত্যু শোক তাঁর ছোট্ট হৃদয়ে তখনো জীবন্ত, জ্বলন্ত। তখন তাঁর মাথার উপর আরেক বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের স্নেহ-ছায়া-ঘেরা আশ্রয়ও তিনি হারালেন। এভাবে আট বছরের এতীম আবার বুঝি এতীম হলেন।

বালক মুহাম্মদ এখন একা। নিজেই তিনি তাঁর দুঃখের সঙ্গী। কী করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই জানা নেই। বিপদ-মুছীবতের যেন শেষ নেই। সামনে শুধু অন্ধকার, আলোর কোন ইশারা নেই, আব্বা নেই, আম্মা নেই, দাদা ছিলেন, তিনিও নেই। জগত-সংসারে তাঁর আপন কেউ নেই। দুঃখের পাত্র যেন তাঁর পূর্ণ হয়ে উপচে পড়লো।

শরীফ ঘরের এ আদরের দুলালকে পিতৃমাতৃহীন এমন এতীম ও নিঃসঙ্গ করার পিছনে সম্ভবত মহামহিমের নিগূঢ় কোন হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিলো। কেননা আসমানী দায়িত্বের যে গুরুভার আগামী দিন তাঁর উপর অর্পিত হবে তা আঞ্জাম দিতে হলে 'আত্মিক' অভিজ্ঞানের ঠিক

ততটাই প্রয়োজন যতটা প্রয়োজন তাত্ত্বিক জ্ঞানের। তাই দেখা গেলো, আল-হেরার নির্জন গুহায় আল্লাহ যখন সেই 'এতীম শিশুটির' উপর নবুয়তের সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করলেন তখন তিনি সর্বোত্তম সফলতার সাথে অর্পিত ঐশী দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরব-আজমের সকল এতীম-বিধবা, গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের জন্য হতে পেরেছিলেন সর্বোত্তম সহায়, হতে পেরেছিলেন বিশ্বজনীন করুণা ও রাহমাতুল্লিল আলামীন।

'সর্বহারা' এই এতীম শিশুকে এখন কে দেবে আশ্রয়! এমন আর কে আছেন যিনি যুগপৎ পিতৃস্নেহ ও মাতৃমমতায় তাঁকে প্রতিপালন করতে পারেন! কিন্তু আল্লাহর অপার হিকমত ও লীলারহস্য বোঝা কার সাধ্য! সেই কঠিন মুহূর্তে চাচা আবু তালিব এগিয়ে এলেন এবং এতীম ভাতিজাকে বুকে তুলে নিলেন। তেমন কোন আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো না তার, তদুপরি ছিলো একটি বড় পরিবারের ভরণ পোষণের গুরুদায়িত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম সমাদরে ও সৌভাগ্যজ্ঞানে তাঁকে তিনি আপন পরিবারভুক্ত করে নিলেন। বালক ও যুবক মুহাম্মদের তিনি যেমন উত্তম অভিভাবক ছিলেন তেমনি ছিলেন নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুঃখ-কষ্টের ও বিপদ-দুর্যোগের আমৃত্যু সঙ্গী। বড় ওয়াফাদার ছিলেন তিনি এবং জীবন ও ইজ্জতের ঝুঁকি নিয়ে ওয়াফাদারির লাজ রেখেছিলেন।

***

আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁর হাতেখড়ি হলো। চাচার সঙ্গীরূপে বিভিন্ন বাণিজ্যসফরেও যাওয়া-আসা হতে লাগলো। পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি কমবেশী তেজারত করেছেন এবং অত্যন্ত সফলভাবেই করেছেন। এমন কি সর্বত্র তাঁর অতুলনীয় সততা, বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার এমন সুখ্যাতি হলো যে, সে যুগের অন্ধকার আরবের 'অন্ধকার' লোকেরাও তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালো 'আল-আমীন' বলে।

সকলের ধারণা, ব্যবসা ও সততা হলো দুই বিপরীত মেরুর বিষয়। আগুন-পানি একত্র করা কঠিন, সততা রক্ষা করে ব্যবসা করা আরো

কঠিন। কেননা ব্যবসা হলো এক অগ্নিকুণ্ড, মুনাফার চাহিদা যার আগুন এবং লোভ-লালসা যার ইন্ধন। সুতরাং সে ইন্ধনে সততা ও সত্যবাদিতা ভস্ম হলে তবেই না ব্যবসার অগ্নিকুণ্ড তেজীয়ান হতে পারে! ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় ছাড়া – যত বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষই হোক – বাজার তার মন্দা যাবে এবং ব্যবসা তার লাটে ওঠবে। সোনাচাঁদি যেখানে খাতির ও ভালোবাসার মাপকাঠি সেখানে 'ক্রেতা-সেবার' উদ্দেশ্য মুনাফা ও মুনাফেকি ছাড়া আর কী হতে পারে!

মানুষ ও মনুষ্যত্বের সেই দুর্ভিক্ষকালে ধোকা, প্রতারণা ও মিথ্যাচারিতার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা এবং সততা, সত্যবাদিতা ও পবিত্রতার উপর অবিচল থেকে 'আল-আমীন' হওয়া কি সহজ কথা! তদুপরি কোন সমাজে! আরবের অন্ধকার সমাজে, যেখানে জ্ঞানের আলো নেই, আকলের রোশনি নেই, নীতি ও বিবেকের বালাই নেই, সর্বত্র অনাচার ও পাপাচারের জয়জয়কার, ন্যায় ও মানবিকতার হাহাকার। সকলে যেন দুষ্টের সেরা, শয়তানের বাড়া। এমন সমাজে, এমন পরিবেশে, এমন লোকদের মাঝে সত্য ও সততার উজ্জ্বল তারকা হয়ে জ্বলজ্বল করা এবং জীবন, যৌবন ও নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরা মুহূর্তের কল্পনায়ও কি সম্ভব কারো জন্য! এমন বুকের পাটা দেখাতে পারে কোন্ আদমের বেটা!

সর্বোপরি কোন্ বয়সে! পঁচিশের টগবগে যৌবনে, বিচ্যুতি ও পদস্খলনের সবচে' খতরনাক সময়কালে, উচ্চাভিলাষ ও উন্মাদনা যখন মানুষকে এমনই লাগামহীন ও বেপরোয়া করে তোলে যে, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কল্যাণ-অকল্যাণ ভেবে দেখারও অবকাশ থাকে না। সবকিছু ভেসে যায় পাশবিকতার প্রবল তোড়ে। 'মানব-পশুর' তখন একমাত্র ভাবনা, কোন্ পথে, কোন্ উপায়ে প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করা যায়! উন্মত্ত যৌবনের লালসা মেটানো যায়!

যৌবনকাল বড় বিপজ্জনক কাল। যৌবন-সাগর এমনই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এবং প্রবৃত্তির ঝড়ো হাওয়ায় এমনই রুদ্র-উন্মত্ত যে, বিবেকবুদ্ধি ও সংযমসাধনার রক্ষাপ্রাচীর একেবারে ভেঙ্গে যায়। মুহূর্তের অসতর্কতায় কত গুণী মহাগুণীর এবং কত ঋষি মহাঋষির নৌকা ডুবেছে এ উত্তাল দরিয়ায়– কে তার হিসাব রাখে!। সুতরাং বয়সের এই নাযুকতম

সময়কালে কথায় ও কাজে এবং জীবনের প্রতিটি আচরণে ও উচ্চারণে সততা ও পবিত্রতার এমন সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা নিঃসন্দেহে মানবসাধ্যের অতীত, এমন কি মানব-কল্পনারও অতীত।

কিন্তু এখানে সব কিছু অন্য, সব কিছু অনন্য। চক্ষু যাদের আছে তারা দেখে যাও, আল্লাহর কুদরত দেখে যাও। লোকজগতে এর তুলনা খুঁজতে যেয়ো না। নূরানী সত্তার নূর, দেহ ও মৃত্তিকার ধাঁধায় হারিয়ে ফেলো না। ঊর্ধ্বজাগতিক উদ্ভাসে আত্মসমাহিত হও এবং আল-আমীনের জ্যোতির্ময় রূপ অবলোকন করো। সৃষ্টির প্রতিটি কণায় 'আল-ছাদিকের' স্তুতি শ্রবণ করো। মুগ্ধ হও, অভিভূত হও, কিন্তু অবাক হয়ো না। তিনি তো আল-কোরআনের প্রতিধ্বনি, মানবকুলের মধ্যমণি এবং মানবতার সঞ্জীবনী

***

মক্কায় তখন খাদিজা নাম্নী ধনবতী, কূলবতী ও নিষ্ঠাবতী এক বিধবা ছিলেন। বয়স তাঁর চল্লিশ কিংবা কিছু কম। রূপ-ঐশ্বর্য তাঁর কম ছিলো না, কিন্তু সম্পদ-ঐশ্বর্য ছিলো অনেক বেশী, আর গুণ-ঐশ্বর্য ছিলো আরো বেশী। মোটকথা, কোন অভাব ছিলো না। অভাব ছিলো শুধু উপযুক্ত একজন মানুষের, সৎ ও বিশ্বস্ত একজন মানুষের, নির্ভাবনায় যাকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করতে পারেন। কেননা অবস্থা এই যে, যাকে রাখেন সেই দেখায় বিভিন্ন রকম ভেলকি। কাগজের হিসাব নিখুঁত, কিন্তু ভিতরে শুভংকরের ফাঁকি। তাই ত্যক্তবিরক্ত হয়ে খাদিজা বহু দিন থেকে একজন ভালো মানুষের সন্ধানে ছিলেন। কিন্তু আরবের মাটিতে এতো মানুষের ভিড়ে 'ভালো মানুষ' পাওয়া যে সত্যি বড় কঠিন! তবু বিবি খাদিজা সন্ধান অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে হযরতের নীতি ও নৈতিকতার সুখ্যাতি তাঁরও কর্ণগোচর হলো। তিনি শুনলেন–

'হাশেমী যুবক মুহাম্মদ যেমন যোগ্য তেমনি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি সকলের বিশ্বস্ত আল-আমীন।'

খাদিজা ভাবলেন, আশ্বর্য! এমন যুবকও আছে আরবের বুকে! বহুদিন থেকে আমি যে তাঁরই সন্ধান করি, যিনি আমার অগোছালো বিষয়-সম্পদ

গুছিয়ে দিতে পারেন!

কিন্তু মানুষের সবকিছু যিনি গুছিয়ে দেন তাঁর ইচ্ছা হলো, সায়াহ্নকালে খাদিজার 'জীবন-সম্পদ'ও তিনি গুছিয়ে দেবেন এক দরদী জীবনসঙ্গীর হাতে, যিনি হবেন জগতের আদর্শ মানব, আদর্শ স্বামী।

খাদিজার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপস্থিত হলো হযরতের খিদমতে–

'একজন সৎ ও সত্যবাদী মানুষের বড় প্রয়োজন আমার। আপনার 'আল-আমীন' খ্যাতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে আপনার প্রতি। যদি এ বিশ্বাসের মর্যাদা আপনি রক্ষা করেন এবং আমার ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে সন্তুষ্ট চিত্তে আমি দ্বিগুণ লভ্যাংশ দিতে রাজী। এ প্রস্তাব মনঃপূত হলে আমি আপনাকে স্বাগত জানাই।'

চাচা আবু তালিবের পরামর্শ নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদিজার প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। খাদিজাও তার 'সুনির্বাচনের' সুফল হাতে হাতে পেলেন। সিরিয়ার বাণিজ্যসফর এমনই সফল ও লাভজনক হলো যে, খাদিজা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

হযরতের সুখ্যাতি বিবি খাদিজা এতদিন শুধু 'শ্রবণ' করেছেন, কিন্তু এবার তা 'অবলোকন' করে তিনি বুঝলেন, অতি সামান্য ছিলো তাঁর 'শ্রবণ'। মাটির মানুষও হতে পারে এমন পবিত্র! এতো নির্মোহ! যোগ্যতা ও সততার এমন মহামিলনও কি সম্ভব কোথাও কখনো! তাই এ সুনির্বাচনের জন্য নিজেই নিজেকে সাধুবাদ জানালেন তিনি।

সময় তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চললো। বিবি খাদিজার হৃদয়ে হযরতের প্রতি শ্রদ্ধার সবুজ বৃক্ষটি যেমন ছায়া-বিস্তার করছিলো, তেমনি প্রেমের সদ্যপ্রজ্বলিত একটি প্রদীপ ধীরে ধীরে তার স্নিগ্ধ আলো বিস্তার করে চলেছিলো।

অন্ধরা, শোনো! চক্ষু আল্লাহর অতি বড় নেয়ামত। বিবি খাদিজার 'চক্ষু' ছিলো, তাই মুহাম্মদের মাঝে ঐশী নূরের উদ্ভাস তিনি অবলোকন করতে পেরেছিলেন। একদিকে নূরানী সত্তা, অন্যদিকে অন্তর্দৃষ্টি! সুতরাং হৃদয়ের স্বচ্ছ পর্দায় কেন তার উদ্ভাস হবে না! মহামহিমের অদৃশ্য

ইঙ্গিতেই যেন বিবি খাদিজার পবিত্র হৃদয়ের কোমল ভূমিতে অনুরাগের অংকুরোদ্গম হলো। হৃদয়াকাশে প্রেমের তারকা-প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলে উঠলো। হযরতের দেহসত্তার ও অন্তরাত্মার পবিত্রতা ও নূরানী সৌন্দর্য বিবি খাদিজার অজান্তেই যেন তাঁর হৃদয়রাজ্য অধিকার করে নিলো। কিন্তু হৃদয় রাজ্য হারিয়ে তিনি যেন স্বর্গ রাজ্য জয়ের আনন্দ লাভ করলেন।

বিবি খাদিজার তখনকার মনের ভাব হয়ত এমন ছিলো–

'বেশ তো ছিলাম এতদিন! কিন্তু আমার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে এ কেমন তরঙ্গ দোলা শুরু হলো আজ! অবুঝ মন কেন এমন স্বপ্ন দেখছে যা হয়ত কখনো পূর্ণ হওয়ার নয়!

তাছাড়া মক্কার লোকেরাই বা কোন্ চোখে দেখবে চল্লিশোর্ধ্ব জীবনের হৃদয়দিগন্তের এ আবির খেলা! বড় সুন্দর, বড় মধুর, তবু যে মনে জাগে ভারি লজ্জা!

সর্বোপরি কী ভাবছেন প্রিয় মুহাম্মদ! আমার যৌবনে তো এখন ভাটির টান, অথচ তিনি পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক, যাঁর সৌন্দর্যসুষমার নেই কোন তুলনা। চাহনিতে যাঁর কী এক যাদুমায়া! নূরানী চেহারায় কী এক স্বর্গীয় আভা! কিন্তু প্রিয় মুহাম্মদ কি বোঝবেন আমার মনের কথা! আমার মনের ব্যথা!

এভাবে অদ্ভুত এক দোদুল্যমনতায় বিবি খাদিজার দিন, রাত্রে এবং রাত্র, দিনে পরিবর্তিত হতে লাগলো। কিন্তু মনের সুপ্ত পবিত্র বাসনা পূর্ণ হতে পারে এমন আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও তিনি দেখতে পেলেন না। অবশেষে নিরাশ মনে তিনি সান্ত্বনা পেতে চাইলেন কাবাঘরের তাওয়াফের মাঝে।

দেহের স্থূলতাকে অতিক্রম করে যে পবিত্র প্রেম আত্মার সমীপে সমর্পিত হয় তা মানুষকে যেমন চিন্তায় মহীয়ান করে, তেমনি চেতনায় বলীয়ান করে। হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বিবি খাদিজার প্রেম ছিলো পূত-পবিত্র আত্মিক প্রেম। দেহের দুয়ারে নয়, আত্মার গভীরে ছিলো সে প্রেমের আবেদন। হযরত মুহাম্মদের দেহসত্তায় আসমানী নূরের যে আভা তিনি অবলোকন করেছিলেন সেটাই ছিলো তাঁর

প্রেমের মূল। তাই প্রেমের অপূর্ব এক আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিবি খাদিজা সিদ্ধান্ত নিলেন–

'প্রিয় মুহাম্মদের সমীপেই আমি নিবেদন করবো আমার হৃদয়ের বেদনা তাঁকেই জানাবো আমার কামনা ও প্রার্থনা, আমার আকুতি ও মিনতি। আমি বলবো–

'আল-আমীন! আপনার বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি তো আরব-জোড়া, কিন্তু আমার বেলা! ব্যবসা-সম্পদ আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, কিন্তু হৃদয়-সম্পদ কেন আপনার দখলে গেলো!

দেখি, ভিখারিণীর ব্যথিত হৃদয়ের আকুল জিজ্ঞাসার কী জবাব তিনি দেন!'

কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন লাজ রক্তিম হয়ে ওঠেন তিনি। ভাবেন–

'মুখ ফুটে এতো কথা বলার সাহস পাবো কোথায়! এতদিন একটি বারের জন্যও কি তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পেরেছি? প্রেম মুগ্ধতার অতুল প্রভাব মুহূর্তের জন্যও কি এড়াতে পেরেছি?'

নিজেকে তিনি যত শক্ত করেন ততই যেন ভেঙ্গে পড়েন। এভাবে চলে তাঁর মনের চিন্তা-ভাবনার অদ্ভূত ভাঙা-গড়া। মনের মাঝে কত কল্পনা, কত পরিকল্পনা লুকোচুরি খেলে, আনাগোনা করে, কিন্তু দ্বিধা-জড়তার অবসান হয় না। প্রেমের একি মধু-যন্ত্রণা! একি আশ্চর্য বিড়ম্বনা!!

একবার নিজেকে তিনি এই বলে প্রবোধ দেন, এতো নিষ্ঠুর হতে পারেন না তাঁর আল-আমীন, কিন্তু পরক্ষণে নিরাশার ঝাপটা আশার আলো নিভিয়ে দেয় যেন। বিবি খাদিজা তখন চারপাশের জীবন ও কোলাহল থেকে উদাসীন হয়ে বসে থাকেন, আর অপলক চোখে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকেন।

অন্যদিকে 'ভাগ্যদেবী' যেন স্নিগ্ধ হাসির পরশে এভাবে তাঁকে আশীর্বাদ করেন–

'সবুর করো মা! যে শাহে দোজাহানের মালেকা হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে তোমার জন্ম, তিনি যে তোমারই প্রিয়তম মুহাম্মদ! যে সাইয়েদুল

মুরসালীনের প্রথম উম্মত হওয়ার মহাগৌরব তোমার জন্য সুনির্ধারিত, তিনি যে তোমারই প্রিয়তম আহমদ! তুমিই তো হবে শ্রেষ্ঠ নবীর ভাগ্যবতী জীবন সঙ্গিনী– এ যে বিধাতার লিখন! উর্ধ্বলোকে সৃষ্টির আদিতে সুসম্পন্ন তোমাদের বিবাহ বন্ধন ইহলোকে প্রকাশ পাওয়ার শুভলগ্ন যে সমাসন্ন! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ইহ জন্ম!'

দূত-মুখে বিবাহ প্রস্তাব শুনে আমাদের হযরত মৃদু মধুর হেসে বললেন, আমার কী আপত্তি থাকতে পারে! তবে ভাবছি; আমি দরিদ্র, তিনি ধনবতী। সম্পদ ও দারিদ্র্যের মিলন কি সুখের হবে?

আশ্বাসের 'সন্দেশবাণী' নিয়ে দূত যখন ফিরে এলো, বিবি খাদিজার অবস্থা তখন কবির ভাষায়–

'সুখের প্রথম পরশে আমার অস্তিত্ব বিলীন হলো। তোমার ইশারাকে তাই মনে হলো বিধাতার ফায়সালা।'

খাদিজা জবাব পাঠালেন, 'ধনসম্পদ যদি আমার কাম্য হবে, কোরেশের ধনবানদের প্রস্তাব কেন তবে ফিরিয়ে দিলাম? শুভমিলনে সম্পদ যদি আড়াল হয়, সব বিসর্জন দিয়ে তাঁর দারিদ্র্যকে সগৌরবে বরণ করে নিতে আমি প্রস্তুত। আমি তো শুধু তাঁর পদ-সেবার গৌরব-ভিখারিণী! সম্পদের প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে হে প্রিয়তম মুহাম্মদ! এ দাসী নিজেই তো আপনার সম্পদ। সুতরাং আপনার প্রশ্নের আপনিই মীমাংসা দান করুন।'

বিবি খাদিজার হৃদয়ের পবিত্র অনুভূতি হযরতের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করলো। তিনি অনুভব করলেন, বিদুষী খাদিজাই হতে পারেন তাঁর যোগ্য জবিনসঙ্গিনী এবং কোন সন্দেহ নেই, আসমান থেকেই এসেছে এ ফায়সালা। এভাবে পবিত্র প্রেমের স্নিগ্ধ পরশ যেন হযরতের প্রাণ-মন জুড়িয়ে দিলো। মুখের স্নিগ্ধ হাসি যদিও হৃদয়েরই বার্তা তবু দূতকে তিনি মৌখিক সম্মতিও জানালেন। আর প্রতীক্ষার প্রহর গুণে গুণে ক্লান্ত বিবি খাদিজা আনন্দে কেঁদে ফেললেন। হৃদয়-সরোবরে সুখ-তরঙ্গ যেন উথলে উঠলো এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রু যেন মুক্তো-বিন্দু হয়ে ঝরে পড়লো। হৃদয়ের সবটুকু আবেগে উত্তাপে কম্পিত হয়ে তিনি শুধু বললেন, হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

মক্কার গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে এবং আবু তালিবের পৌরহিত্যে অনাড়ম্বর পরিবেশে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলো। চরম ধৈর্যের পরম পুরস্কারই আল্লাহর পক্ষ হতে পেলেন বিবি খাদিজা। ব্যবসার ব্যবস্থাপকরূপে যুবক মুহাম্মদকে তিনি চেয়েছিলেন, অথচ মহান স্বামীরূপে খোদার হাবীব আল-আমীনকে পেয়ে ধন্য হলেন! আল্লাহ্ কত মেহেরবান! কী অসীম তাঁর দয়া ও দান!

বিশ্বস্ত ও নিবেদিত জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজা প্রিয়নবীর সেবায় প্রাণ উজাড় করে দিলেন। স্বামীর সুখ-শান্তি ও স্বস্তি-প্রশান্তিই ছিলো তাঁর দিন-রাতের চিন্তা এবং সকাল-সন্ধ্যার ভাবনা। হযরতের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে সুখ-সচ্ছলতা এনেছিলেন তিনি। নবুয়ত-উত্তর সকল প্রতিকূলতা থেকে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন তিনি। এমন কি তিনিই ছিলেন স্বামীর নবুয়তের প্রথম ঈমানদার। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে প্রেম ও ভালোবাসার এবং আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততার যে সুখময় স্মৃতি স্বামীর অন্তরে তিনি রেখে গিয়েছিলেন তা ছিলো চিরঅম্লান। কোন ঈর্ষা, কোন অভিমান তা এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

পরবর্তী জীবনে যখনই বিবি খাদিজার কথা মনে পড়তো, হযরতের চোখ অশ্রুসজল হতো। দরদভেজা কণ্ঠে তিনি তাঁর নাম নিতেন। আয়েশা ছিলেন হযরতের রূপবতী, গুণবতী ও যুবতী স্ত্রী, অতি আদরের স্ত্রী। তাঁর সামনে হযরত একবার বিবি খাদিজার স্মৃতি স্মরণ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আয়েশা তখন নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈর্ষাবশত বলে উঠলেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে ঐ দাঁতপড়া বুড়ীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি!

ব্যথিত স্বরে হযরত উত্তর করলেন– দেখো, কঠিন দারিদ্র্যের মাঝে তিনি আমার ঘরে এসেছেন এবং আমার জীবনে সুখ-সচ্ছলতা এনেছেন। মক্কা যখন আমাকে অবিশ্বাস করেছে তিনি তখন আমাকে বিশ্বাস করেছেন। গোটা আরব যখন আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তিনি তখন আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। জানো, পাহাড় বেয়ে হেরা গুহায় কে আমার খাবার পৌঁছে দিতো!

বস্তুত জগতের নারীকুলের আদর্শ হলেন বিবি খাদিজা। আগে ও পরে পৃথিবীতে যত নারী-পুরুষ এসেছে এবং আসবে তাদের সকলের পক্ষ হতে

তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এমন মহীয়সী সহধর্মিণী, এমন প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী, সর্বোপরি এম দরদী বন্ধু জগতে আর কোন পুরুষের ভাগ্যে হবে না কোন দিন। কেননা তিনি তো ছিলেন নবী মুহাম্মদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অদূর ভবিষ্যতে যিনি হবেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারী, ওহী ও রিসালাতের বাহক আল্লাহর প্রেরিত নবী, স্বভাবতই তাঁর জীবনে এমন কিছু ঘটনার সমাবেশ ঘটে যা তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে এবং এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে, জড়দেহের অধিকারী হলেও ইনি সাধারণ মানব নন; বরং অতিমানব।

কিছু কিছু ঘটনা স্পষ্টতই এ শুভ ইঙ্গিত প্রদান করছিলো যে, মানবতার পূর্ব দিগন্তে সৌভাগ্যরবির উদয় সমাসন্ন। আর তিনি মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কেউ নন। মহামহিম তাঁরই পবিত্র হাতে সেই চিরন্তন আলোক প্রদীপ জ্বালবেন, যুগে যুগে দিকভ্রান্ত মানব যার আলোকে সত্যের পথ খুঁজে পাবে।

যায়দ নামক অল্পবয়স্ক একটি দাস বিবি খাদিজার নিকট ছিলো। তার প্রতি বিবি খাদিজার যত্নের ত্রুটি ছিলো না; তবু দাসত্বের মাধ্যমে স্বাধীন মানবসত্তার অবমাননায় হযরতের মানবদরদী হৃদয় কেঁদে উঠলো। তিনি ভাবলেন, আদমের সন্তান কেন দাসত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াবে! এর কি কোন প্রতিকার নেই! অবশেষে একদিন দাস যায়দকে তিনি বিবি খাদিজা থেকে চেয়ে নিলেন এবং আযাদ করে দিলেন। কিন্তু বিধাতার কী রহস্যলীলা! দাসত্বের শেকল থেকে মুক্তি পেয়ে স্নেহ-ভালোবাসার শেকলে সে এমনই বন্দী হলো যে, মনিব মুহাম্মদের পদ সেবা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইলো না। এমন কি তাকে নিতে আসা বাবা ও চাচার সাথেও যেতে রাজী হলো না।

হযরতের হৃদয়ে, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার মর্যাদা ছিলো সবকিছুর উপরে। তাই ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রতিদানরূপে যায়দকে তিনি কাবাচত্বরে দাঁড়িয়ে পুত্রের মর্যাদা দান করলেন এবং হাশেমী কন্যা যয়নবকে তার সাথে বিবাহ দিলেন। ক্রীতদাসকে পুত্রের মর্যাদায় তুলে আনার মাধ্যমে মানব মুহাম্মদের 'দেবতা-চরিত্রের' যে অনুপম প্রকাশ

ঘটলো তার তুলনা পিছনের ইতিহাসে কিংবা আজকের সভ্য সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্রীতদাসের জীবন-মরণ তো নির্ভর করতো মনিবের মর্জির উপর। মারো, ধরো, খুন করো– কোন অপরাধ নেই, কারণ সে মানুষ নয়, ক্রীতদাস! তখন আরবে-আজমে সবখানে ছিলো দাসজীবনের এ বিভীষিকা। সেই বর্বর সমাজে তুচ্ছ ক্রীতদাসের প্রতি এরূপ সদয় আচরণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্যি অসম্ভব। এ শুধু পারেন তিনি, আগামীকাল যিনি হবেন মানবতার মুক্তিদূত। দাস-মনিবের মাঝে মানবসাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর পক্ষেই শুধু সম্ভব, আল্লাহ যাঁকে বানাবেন মানবতার জন্য সত্যের পথপ্রদর্শক।

***

সন্ধিপ্রিয়তা ছিলো হযরতের স্বভাবগুণ। লড়াই-ফাসাদের উপক্রম হওয়ামাত্র তিনি সেখানে উপস্থিত হতেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য ও ন্যায়ানুগ মীমাংসা দিতেন। আর এমনই ছিলো তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী প্রভাব যে, সকল পক্ষই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতো তাঁর সিদ্ধান্ত।

একবারের ঘটনা। কালের বিবর্তনে কাবাঘরের এমন ভগ্নদশা হলো যে, তার পুনর্নির্মাণ অনিবার্য হয়ে পড়লো। এ জন্য কোরেশের সকল শাখা সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করলো। কিন্তু বিবাদ দেখা দিলো হাজরে আসওয়াদ বা 'কৃষ্ণপ্রস্তর' পুনঃস্থাপন প্রশ্নে। কেননা এটা ছিলো গৌরব ও মর্যাদার বিষয়। তাই কোরেশ গোত্রের প্রত্যেক শাখা রক্ত-পাত্রে হাত ডুবিয়ে শপথ করলো–

রক্তের শেষ বিন্দু বিসর্জন দেবো তবু এ মর্যাদা হাতছাড়া করবো না। 'কৃষ্ণপ্রস্তর' আমাদেরই হাতে পুনঃস্থাপিত হবে, অন্য কারো হাতে নয়।

ফলে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলো। এমতাবস্থায় কোরেশের প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ রক্তপাত এড়াতে আলোচনায় মিলিত হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন, আগামী প্রভাতে প্রথম যিনি কাবাঘরে প্রবেশ করবেন তিনি এর মীমাংসা দেবেন, সকল পক্ষ অম্লান বদনে তা মেনে নেবে।

আল্লাহর কী শান! মুহাম্মদ 'আল-আমীন' হলেন প্রথম প্রবেশকারী।

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ফলে সকল পক্ষ খুশি মনে তাঁর হাতে মীমাংসার ভার ছেড়ে দিলো।

প্রাণ উৎসর্গ হোক তোমার পবিত্র চরণে হে আল-আমীন! এমন অপূর্ব প্রজ্ঞাপূর্ণ মীমাংসা পৃথিবীর কোথায় কে কবে দেখেছে! সব দিক বিবেচনা করে হযরত বললেন, একটি চাদর বিছাও। বিছানো হলো। তিনি স্ব-হস্তে 'কৃষ্ণপ্রস্তর' তাতে স্থাপন করলেন। সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসিটুকু তখনো তাঁর পবিত্র মুখে, অতি পাষাণ-হৃদয়ও যার সম্মোহন এড়াতে পারেনি কখনো। এবার তিনি বললেন, প্রত্যেক শাখার একজন করে প্রতিনিধি চাদর-প্রান্ত ধরে হাজরে আসওয়াদ বহন করে কাবাচত্বরে নিয়ে চলো।

এমন আদেশ পালন করাতেই যেন আনন্দ! তাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে আদেশ পালন করলো, আর তিনি স্ব-হস্তে 'কৃষ্ণপ্রস্তর' যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করলেন। ন্যায় ও ইনসাফের নিক্তিতে মাপা এ অপূর্ব মীমাংসায় সকলে ধন্য ধন্য করলো। ধন্য ধন্য করছে যুগযুগের মানুষ। কত যুগে মহামান্য কত বিচারক কত বিচার করে গেলেন! কত মীমাংসা দিয়ে গেলেন! কিন্তু আরবের আল-আমীনের এই একটি বিচারের, এই একটি মীমাংসার তুলনা কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি।

বস্তুত এ ঘটনায় এবং এ ধরনের আরো কিছু ঘটনায় দু'একজন চিন্তাশীল যারা ছিলেন, তাদের চিন্তা-জগতে অবশ্যই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। তাদের বুঝতে বাকি ছিলো না যে, মানব-ইতিহাস তার সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় অতি ধীর লয়ে এক নতুন পথে মোড় নিতে যাচ্ছে। মানবতার দিকভ্রান্ত জাহাজ এখন তার নাবিকের ইশারায় নিরাপদ তীরের সন্ধান পেতে চলেছে।

***

শৈশব থেকেই হযরতের স্বভাব ছিলো নির্জনতাপ্রিয়। লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে গিয়ে তিনি বসতেন। অজানা কী এক তন্ময়তায় ডুবে থাকতেন! মক্কার অদূরে নির্জন মরুভূমির কোল ঘেঁষে অবস্থিত হেরা পর্বত ছিলো তাঁর নির্জনবাসের প্রিয়তম স্থান। এখানে পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় এক গুহায় প্রায় পূর্ণ রমযান তিনি নির্জনবাস করতেন। চর্ম চক্ষু বুজে

অন্তর্চক্ষু মেলে সৃষ্টিলোকের অসীম রহস্য অবলোকনে আত্মনিমগ্ন হতেন।

হায় দুর্ভাগিনী ভারতমাতার দুর্ভাগা সন্তান! তোমার জন্ম যদি হতো চৌদ্দশ বছর পূর্বে, তোমার জীবন যদি হতো মুহূর্ত কালের, আর তা ব্যয় হতো হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন পবিত্র দৃশ্য অবলোকনে!

বয়সের সমান্তরালে হযরত মুহাম্মদের হৃদয়জগতের ভাব-চিন্তার গভীরতাও ছিলো ক্রমবর্ধমান। ঊর্ধ্বলোকের অপার রহস্যের নব নব দিগন্ত তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়ে চলেছিলো। এ আত্ম জিজ্ঞাসা বার বার তাঁকে নাড়া দিচ্ছিলো, কে আমি? কোথা হতে, কী উদ্দেশ্যে আমার আগমন? কোথায়, কোন সুদূরে আমার শেষ গমন?

কখনো ভাবতেন, এই যে আসমান-জমীন, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, এই যে জিন-ইনসান কুলমাখলুকাত– এ সব কার সৃষ্টি? কে খালিক? কে মালিক? কার ইশারায় চলছে সারা জাহান? কার সাজানো এ জগতসংসার? সৃষ্টিলোকের অপার রহস্য কার কুদরতের প্রমাণ?

বিশ্ব জগতের নিয়ন্তা ও পরিচালক একজন আছেন তো নিশ্চয়। তিনি রব, তিনি আল্লাহ। কিন্তু কোথায় তিনি! তাঁকে জানার পথ কী! তাঁকে পাওয়ার উপায় কী! কে দেবে আমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা! কে মেটাবে আমার অচেনার এ পিপাসা!

এভাবে তাঁর আত্মার জিজ্ঞাসা ও চিন্তার আকুলতা এবং হৃদয়ের উত্তাপ ও সান্নিধ্যের ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মোটকথা, এ ছিলো এমন এক রহস্যময় ধাঁধা যার সমাধান তিনি খুঁজে পান না। ধ্যানসাধনায় তাঁর কোন ত্রুটি নেই, কিন্তু রহস্যেরও কূল-কিনারা নেই।

আবার তিনি ঊর্ধ্বজগতের সুউচ্চ সোপান হতে ব্যথিত চিত্তে অবলোকন করেন অধঃজগতে মানবের অধঃপতন এবং মানবতার করুণ ক্রন্দন। তখন 'ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বের' সেই মহান সত্তাকে, যাঁকে তিনি স্রষ্টারূপে চিনেছেন, আল্লাহ বলে জেনেছেন, তাঁকে যেন তাঁর ব্যথিত আত্মা আর্তনাদ করে বলতে চায়–

কে তুমি এ মহাবিশ্বের মহাব্যবস্থাপক! কে তুমি এ বিশাল সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক! এখনো কি সময় আসেনি মানবতার মুক্তির? এখনো কি আছে দেরী আঁধার শেষে হেদায়তের সূর্যোদয়ের? আর কত দেরী! রাত পোহাবার আর কত দেরী!

কাঙ্ক্ষিত শুভলগ্ন যখন সমাসন্ন, তখন হেরাগুহায় হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধ্যাননিমগ্নতা ও ভাবতন্ময়তা আরো গভীর হলো। অবশেষে একদিন এলো সেই পরম মুহূর্ত, সর্বরহস্যের পর্দা হলো উম্মোচিত, পরম সত্যের সঙ্গে হলো তাঁর শুভ আলিঙ্গন। আল্লাহ তাঁকে বানালেন আপন প্রিয় রাসূল, শ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ রাসূল।

হযরত তখন হেরার নির্জন গুহায় গভীর ধ্যানমগ্ন। এমন সময় ভেসে এলো এক অদৃশ্য নির্দেশ, পড়ো হে মুহাম্মদ!

হযরত চমকিত হলেন, শিহরিত হলেন। কিসের এ গায়েবী আওয়াজ! হেরার নির্জন গুহায় এ কার কণ্ঠস্বর! এমন তো আর হয়নি! তবে! তবে কি....?

আবার ভেসে এলো সেই একই আওয়াজ, পড়ো হে মুহাম্মদ!

তখন একান্ত অভিভূত অবস্থায় গায়েবী আওয়াজের উদ্দেশ্যে হযরত বলে উঠলেন, আমি তো উম্মী! পড়া জানি না!

তৃতীয়বার আওয়াজ এলো, পড়ো আপন প্রতিপালকের নামে ....।

ওহী ও আয়াত অবতরণের ঐশী ভাবগম্ভীরতায় এবং গায়েবী আওয়াজের সম্মোহন অলৌকিকতায় অজানা এক ভয়-বিহ্বলতায় হযরত মুহাম্মদ আচ্ছন্ন হলেন এবং এ আচ্ছন্ন অবস্থায় স্ব-গৃহে উপস্থিত হলেন, যেখানে প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী তাঁর জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন। হযরত মুহাম্মদ যা যা ঘটেছে সব তাঁকে খুলে বললেন।

বিবি খাদিজা এতদিন স্বামী মুহাম্মদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রিয়তম স্বামীকে কেন্দ্র করে অদৃশ্যলোকে কিসের যেন একটা আয়োজন চলছে। তাঁর অগোচরে কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। তিনি দেখতে পান না, কিন্তু আভাস পান,

অনুভব করেন। তিনি জানেন, স্বামী তাঁর জড়দেহের মানুষ হলেও আলোর আধার, নূরের ভাণ্ডার। মহৎ কোন আসমানী উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁর জন্ম, তাঁর জীবন। মনের এ ভাব ও ভাবনা এবং চিন্তা ও উৎকণ্ঠা মনেই সুপ্ত রেখে সঙ্গোপনে সবকিছু তিনি পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন।

হেরা-গুহার গায়েবী আওয়াজে সকল রহস্য যেন খুলে গেলো। এ যে তাঁর মনের সুপ্ত বাসনারই কাঙ্ক্ষিত প্রকাশ! তাই প্রশান্ত চিত্তে, অবিচলিত কণ্ঠে স্বামীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

'সারতাজ আমার! মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। ওহী ছাড়া এ অন্য কিছু নয়। জিবরীল এসেছেন আপনার কাছে আসমানী পয়গাম নিয়ে। নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। দাসী খাদিজা আপনার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনছে।'

সুবহানাল্লাহ! প্রিয়তম স্বামীর পদসেবায় জীবন-সম্ভার ও সম্পদ-ভাণ্ডার যিনি উৎসর্গ করেছিলেন তিনি আজ স্বামীর একটি মাত্র কথায় পূর্বপুরুষের যুগযুগের লালিত ধর্মবিশ্বাস বর্জন করলেন! নিশ্চিন্ত ভরসায় স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন! শুধু তাই নয়, সদ্য নবুয়তপ্রাপ্ত স্বামীর মাথায় 'আচল' ধরে সান্ত্বনার ছায়া বিস্তার করলেন! ভক্তি ও বিশ্বাসের এবং মমতা ও ভালোবাসার এমন আদর্শ নারী ভিন্ন আর কে হতে পারেন নবীর জীবনসঙ্গিনী! তিনি ছাড়া আর কে হতে পারেন সৌভাগ্যবতী প্রথম মুসলিম! মহীয়সী খাদিজা তাঁর যোগ্য পুরস্কারই পেয়েছেন।

অল্প ক'দিনের ব্যবধানে আর যাঁরা ঈমান আনলেন তাঁরা হলেন হযরত খাদিজার চাচাত ভাই ওয়ারাকা, আবু তালেবের বালক পুত্র আলী ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়দ।

হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এই তিন অনুসারীকে সঙ্গে করে নির্জন স্থানে আল্লাহর ইবাদত করতেন। ধীরে ধীরে আরো কিছু মানুষ ঈমানের এ ক্ষুদ্র কাফেলায় শরীক হলেন। এভাবে তিন বছরের নীরব প্রচেষ্টায় মাত্র তেরজন মানুষ পাওয়া গেলো যাঁরা হযরতকে বিশ্বাস করে ঈমানের আলোক গ্রহণ করলেন এবং সত্যের কাফেলায় প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

***

এবার প্রকাশ্য সভায় সত্যের উদাত্ত আহ্বানের সময় এসে গেলো। হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাফা পর্বতের পাদদেশে ডাক দিলেন। কোরেশদের সকল শাখার চল্লিশজন নির্বাচিত লোকের সমাবেশে অত্যন্ত আবেগ ও দরদপূর্ণ ভাষায় ঈমানের দাওয়াত দিলেন। মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করার আবেদন জানালেন।

বিশ্বের বুকে সত্যের প্রথম আহ্বানের সে 'কণ্ঠবাণী' ধারণ করে রাখা সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর দরদপূর্ণ কণ্ঠ ইথারে ইথারে আজো যেন শুনতে পাই। সে আহ্বানে এখনো, এত শতাব্দীর ব্যবধানেও কত মানুষ উদ্বেলিত হয়, আপ্লুত হয়, লাব্বাইক বলে সাড়া দেয়, অথচ সাফা-পাদদেশের দুর্ভাগারা অত নিকট থেকে অবলোকন করলো, শ্রবণ করলো, কিন্তু গ্রহণ করলো না; বরং অশালীন মন্তব্যসহ শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দিলো। সেখানে উপস্থিত হযরত আলীর তরুণ রক্ত কোরেশের এ আস্পর্ধা সহ্য করতে পারলো না। তিনি দাঁড়ালেন এবং আবেগ-উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন–

'হে আল্লাহর নবী! এখানে বয়সে যদিও আমি সবার ছোট এবং বড়দের মজলিসে মুখ খোলা যদিও অশোভনীয়, তবু মক্কার কোরেশ শুনে রাখুক, আপনার মর্যাদা আমি জানি এবং আপনার আহ্বানের গুরুত্ব উপলব্ধি করি। সুতরাং আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে, আপনার সেবায় জীবন বিলিয়ে দিতে কৃতার্থ চিত্তে আমি প্রস্তুত।'

গোটা আরবের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তরুণ কণ্ঠের এ আবেগ-উদ্দীপ্ত ঘোষণা হয়ত সেদিন হাস্যকর মনে হয়েছিলো। উপস্থিত লোকেরা হয়ত বা উপহাসও করেছিলো। কিন্তু তারা কি জানতো, ভবিষ্যতের পৃথিবী এবং সর্বজাতির জ্ঞানী-গুণী 'মূর্খ' বলে তাদেরই উপহাস করবে?

তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত যত জোরদার হতে লাগলো, বিরোধিতার মাত্রা তত বেড়ে চললো, কোরেশ তত মারমুখী হতে থাকলো। আল্লাহর নাম শুনে তারা আগুন হয়ে ওঠে, মূর্তিপূজার সমালোচনায় ক্রোধে জ্বলে ওঠে এবং আল্লাহর নবীর প্রতি আক্রোশে ফেটে পড়ে।

অবশেষে কোরেশ আবু তালিবকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে বলে দিলো–

আপনার ভাতিজা নবুয়তের দাবীদার হয়েছে এবং পূর্বপুরুষের ধর্ম ও উপাস্যের নিন্দা শুরু করেছে। এমন কি আমাদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে উপহাস করছে। এ আস্পর্ধা অসহ্য। আপনার খাতিরে এতদিন সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তাকে নিরস্ত করুন, অন্যথায় আমরা এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো যা আপনার জন্য হবে অপ্রীতিকর।

আবু তালিব চিন্তিত হলেন। কেননা কোরেশ ও তার স্বভাব তিনি ভালো জানেন। তাই প্রিয় ভাতিজাকে ডেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে সস্নেহে বললেন, 'ভাতিজা! তোমার কওম আমাকে এসে এই এই বলে গেলো। দেখো, মাত্র তেরজন অনুগামীর ক্ষুদ্র লোকবল নিয়ে সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাওয়া নিছক বোকামি। আমার কথা শোনো; এ আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড বন্ধ করো। এতে তোমারও কল্যাণ, আমারও কল্যাণ। জীবনের শেষ ক'টি দিন আমাকে নির্বিঘ্নে কাটাতে দাও। সাধ্যের অধিক বোঝা আমার উপর চাপিও না।'

হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতি প্রশান্ত চিত্তে চাচার বক্তব্য শুনলেন। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে, আপন-পর সকলের সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে যে কারো মনোবল ভেঙ্গে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি তো বিশ্ব-মানবের মুক্তির দিশারী! আল্লাহর প্রেরিত বিশ্বনবী! তাই চাচার এমন 'হাল ছাড়া' বক্তব্যের মুখে তিনি যেন নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত হলেন এবং নববলে বলীয়ান হলেন। চোখ তাঁর অশ্রুসজল হলো, মুখমণ্ডল বেদনাভারাক্রান্ত হলো, কিন্তু কণ্ঠ ছিলো এমন বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত, যেন আসমানী 'জালাল' তাঁকে সম্মোহিত করেছে। তিনি বললেন–

'প্রিয় চাচা! এ কথা সত্য যে, আপনি আমাকে পিতৃস্নেহে প্রতিপালন করেছেন এবং সকল দুর্যোগে ছায়া দান করেছেন। অপরিসীম আপনার ইহসান ও অনুগ্রহ। কিন্তু আমি বলতে চাই, আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার কোন সওদা হতে পারে না। আল্লাহর কসম! ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, আর বলে, সত্যের ডাক বন্ধ করো, তবু তা করবো না। হয় সত্যের জয় হবে, কিংবা আমি শেষ হয়ে যাবো।

চাচাজান! সমগ্র বিশ্বের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি। এমন কি আপনার স্নেহ-ছায়াও হারাতে পারি, কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমার আল্লাহর সাথে আমি সম্পর্কহীন হতে পারি না। আল্লাহর পথে যদি দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা সহ্য করতে হয় এবং জীবন বিসর্জন দিতে হয় তাহলে সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু জীবনের মোহে, কিংবা মরণের ভয়ে সত্য থেকে আমি বিচ্যুত হতে পারি না। কোরেশের হুঁশিয়ারি এবং আরবের তরবারি কোন কিছুতেই আমি ভীত নই, বিচলিত নই। কেননা আমি তো আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট।'

হযরতের মর্মনিসৃত ও মর্মস্পর্শী এ বক্তব্যে আবু তালিব অভিভূত হলেন। চল্লিশ বছর ধরে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অতি নিকট থেকে তিনি দেখে এসেছেন। কিন্তু আজ যেন তিনি তাঁর নতুন পরিচয় পেলেন। চোখে অশ্রুর আভাস, চেহারায় নূরের উদ্ভাস এবং কণ্ঠস্বরে ঐশী শক্তির অভিপ্রকাশ। এ যেন দেহসত্তাকে ছাপিয়ে নূরানী সত্তায় উদ্ভাসিত নতুন মুহাম্মদ! আবু তালিব বিমুগ্ধ হলেন, স্নেহাপ্লুত হলেন এবং শ্রদ্ধাভিভূত হলেন। অসীম মমতায় তাঁকে কাছে টেনে বললেন–

'বেটা, আট বছরের শৈশব থেকে চল্লিশ বছরের পরিণত যৌবন পর্যন্ত স্নেহ দিয়ে, মায়া-মমতা দিয়ে তোমাকে প্রতিপালন করে এসেছি। ভেবেছো, এখন তোমাকে শত্রুর মুখে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেবো! কখনো না। আমি তো আমার মৃত্যুর পর কী হবে সেজন্য বিচলিত ছিলাম, এখন আমি নিশ্চিন্ত। যাও বেটা, নির্ভয়ে তুমি তোমার আল্লাহর বাণী প্রচার করো, যা ইচ্ছা তা বলো। আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন অনিষ্ট হতে পারে না।

***

কোরেশের ভয়ভীতি প্রদর্শনের কৌশল যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা ভাবলো, এবার পাঁয়তারা বদল করতে হবে। লোভ ও প্রলোভনের জাল বিস্তার করে মুহাম্মদকে থামাতে হবে। রূপ ও রৌপ্যের মোহে তাঁকে ভোলাতে হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরেশের অতি হুঁশিয়ার ও পাকা সমঝদার এক লোককে দায়িত্ব দেয়া হলো। সে বেশ মোলায়েম ভাষায় হযরতকে বললো–

'দেখো মুহাম্মদ! গুণ ও চরিত্রের কারণে তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি। কিন্তু হঠাৎ একি অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করলে তুমি! আসল মতলব কি তোমার? কী চাও তুমি? নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব? তাহলে আমরা তোমার নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত। কিংবা ধনসম্পদ? তাহলে আমাদের সমস্ত সম্পদ তোমার পায়ে লুটিয়ে দিতে রাজী। অথবা রূপসী নারী? তাহলে আরবের সেরা রূপসীরা তোমার পদ সেবার জন্য প্রস্তুত। শুধু আমাদের একটু শান্তি দাও। নতুন ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি বন্ধ করো। আমাদের একটি কথা মেনে নাও, আমরা তোমার সব দাবী মেনে নেবো, সব চাহিদা পূর্ণ করবো।'

হযরত শান্তভাবে সব কথা শুনলেন, তারপর বললেন। কী বললেন? হে সভ্যজাতির মানুষ! সে কথা শোনার আগে একবার ভেবে দেখো, কী মহাঅগ্নি পরীক্ষা এ! জগতের যত ধ্বংস ও অনিষ্ট, তার মূলে ক্ষমতা, সম্পদ ও নারী। এই তিন মোহ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জড়দেহের কোন মানুষের পক্ষে। স্রষ্টার ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নূরানী সত্তার অতিমানব যিনি, তাঁর পক্ষেই শুধু সম্ভব এ সকল মোহের ঊর্ধ্বে ওঠা। তাহলে এই মানদণ্ডে এবার বিচার করো আমেনার পুত্রকে, বিধাতার প্রশংসিত মুহাম্মদকে। এবার শোনো তিনি কী বললেন। আপন-পর ও শত্রু-মিত্র সকলের জন্য যে স্নিগ্ধ-পবিত্র হাসিটুকু তাঁর মুখে লেগে থাকতো সব সময়– সেই হাসিটুকু কোরেশদূতকে উপহার দিয়ে তিনি বললেন–

'তোমার কথা কি শেষ হয়েছে ভাই! তাহলে এবার আমার কথা শোনো। এসব কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহর আদেশে তোমাদেরকে আমি সত্যের পথ দেখাতে চাই, মুক্তির উপায় বাতলাতে চাই। আমি জান্নাতের সুসংবাদ শোনাই, জাহান্নামের হুঁশিয়ারি জানাই। শোন, আল্লাহর কালামের কিছু আয়াত শোনো।'

তারপর হযরত তাকে কতিপয় আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আর সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনলো। তারপর ফিরে এসে কোরেশনেতাদের বুঝিয়ে বললো–

'আল্লাহর কসম! এ মানুষের কালাম নয়, জাদু নয়, কবিতা নয়। এ অন্য কিছু। আমার পরামর্শ যদি শোনো তাহলে বলি, মুহাম্মদকে তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! তাঁর সাথে টক্কর দিলে তোমরা মিসমার হয়ে যাবে।'

কিন্তু হক ও সত্যের প্রতি বিদ্বেষে তাদের এমনই বেসামাল অবস্থা ছিল যে, এ সুপরামর্শে তারা কর্ণপাত করলো না, উল্টো তাকেই ভালোমন্দ শুনিয়ে দিলো।

সকল অপকৌশল যখন ব্যর্থ হলো তখন প্রতিহিংসার আগুনে সমগ্র মক্কা জ্বলে উঠলো। প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে কোরেশগোত্রের সকল শাখার সরদারগণ পরামর্শসভায় বসলো এবং স্ব-স্ব বুদ্ধির দৌড় অনুযায়ী যে যার প্রস্তাব পেশ করতে লাগলো।

কারো কারো মত হলো, কথার জাদুতে মুহাম্মদ অদ্বিতীয়, তাঁর সম্মোহন থেকে বাঁচা খুব শক্ত। যুক্তিতর্কেও তাঁর সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব। তাছাড়া দৈহিক সৌন্দর্যেও তিনি অতুলনীয়। ফলে একবার যারা তাঁর কথা শ্রবণ করে এবং একবার যারা তাঁর সৌন্দর্য অবলোকন করে তারা তাঁর বশীভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে কেউ তাঁর কাছে ভিড়তে না পারে এবং কারো কানে তাঁর কথা প্রবেশ না করে।

কারো কারো মত হলো, আসলে তিনি নিজের ইচ্ছায় চালিত নন। নিশ্চয় কোন অপশক্তি তাঁর উপর ভর করেছে। তাই গণক-জ্যোতিষ দ্বারা তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। তাতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠবেন, আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবো। এভাবে একেকজন একেক রকম মন্তব্য করতে লাগলো।

সবচে' প্রবীণ ও বুদ্ধিমান বলে পরিচিত লোকটি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলো। এবার সে মাথা দুলিয়ে সবার সব কথা নাকচ করে দিয়ে বললো–

বন্ধুরা! এতো সহজ নোসখায় কাজ হবে না। মুহাম্মদ বেঁচে থাকতে আমাদের নিস্তার নেই। মাথা না কেটে এ মাথা ব্যথা দূর করার উপায় নেই। সুতরাং যে ভাবে পারো তাঁকে খতম করো। আমি জানতে চাই, তোমাদের এত নমনীয় আচরণ এবং এত লোভনীয় প্রস্তাব কি তাঁকে

সামান্য টলাতে পেরেছে? তাঁর কর্মকাণ্ডে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতে পেরেছে? সুতরাং নরম চিন্তা ছেড়ে গরম পন্থায় চলো।

সকলে বক্তার 'দূরদর্শিতার' তারিফ করলো এবং একবাক্যে স্বীকার করলো যে, আমাদের সরদার যথার্থ বলেছেন। সুতরাং আর দেরী নয়, এবার ঝাঁপিয়ে পড়ো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের উপর।

কী স্থূল বুদ্ধি! মূর্খদের কী অদ্ভূত যুক্তি! সত্যকে মুছে ফেলার কী হাস্যকর অপপ্রয়াস!! আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ যিনি, আল্লাহর আদেশে পরিচালিত যিনি এবং আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত যিনি– স্ব-জাতির নির্যাতন ও নিপীড়নে তিনি কি হিম্মতহারা হতে পারেন! বাধা যত প্রবল হবে সত্যের গতিবেগ তত দুর্বার হবে, এটাই তো প্রকৃতির অমোঘ বিধান! কিন্তু সে পথই তারা গ্রহণ করলো যে পথে তাদের ধ্বংস এবং সত্যের বিজয় অনিবার্য।

***

শুরু হলো নির্যাতন ও নিপীড়নের বিভীষিকাময় অধ্যায়। সে মর্মন্তুদ কাহিনী যত কম বলো এবং যত কম শোনো তত ভালো। রাতের অন্ধকারে ওরা মুহাম্মদের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো। তাঁর পুষ্পকোমল পবিত্র পদতল কন্টকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতো এবং তা থেকে রক্ত ঝরতো, আর নরাধমেরা দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা করে হাসতো। হায় আফসোস! মানবতার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে যাঁর শুভাগমন, মানুষেরই হাতে তাঁর চলার পথ হলো কন্টকাকীর্ণ। তবু তাঁর মুখের স্নিগ্ধ হাসি কখনো ম্লান হয়নি, মানুষের কল্যাণ কামনা থেমে যায়নি। তিনি যে রহমতের নবী! তিনি যে রাহমাতুল্লিল আলামীন!

হযরত যেখানে দাওয়াতের কথা বলতেন, তাওহীদের বাণী প্রচার করতেন, দুষ্টরা সেখানে চৈ চৈ ও শোরগোল করতো, যাতে তাঁর শান্ত কোমল কণ্ঠস্বর তাদের উৎকট চিৎকারে তলিয়ে যায় এবং শ্রোতার কানে সত্যের বাণী পৌঁছতে না পারে। এমন কি তাঁর পিছনে দুষ্কৃতিকারীদের লেলিয়ে দেয়া হতো, আর তারা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁকে জখম করতো। তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরতো। মক্কার পাথরগুলো কাঁদতো, কিন্তু মক্কার

'মানুষ'গুলো হাসতো, মানবতার কলংকের হাসি।

পর তো পর, এমন কি আপন চাচা আবু লাহাবও ছিলো তাঁর জানের দুশমন। আর আবু লাহাবের স্ত্রী তো ছিলো সাক্ষাৎ পিশাচিনী। হযরতকে কষ্ট দেয়ার নিত্য নতুন পন্থা সে উদ্ভাবন করতো। আপন যদি হয় এমন নিষ্ঠুর তাহলে পরের বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ! সাধারণ লোক যদি হুজুগে মাতে তাহলে আর কিসের অনুযোগ!

হযরত যেখানে যেতেন সেখানেই উপহাস ও কটুক্তি চলতো, টানা-হেঁচড়া হতো। এভাবে বিভিন্ন উপায়ে নাজেহালের চূড়ান্ত করা হতো। কে তাদের বাধা দেবে! কে তাঁকে আশ্রয় দেবে, কিংবা একটু সমবেদনা জানাবে! তিনি সকলের কল্যাণকামী, কিন্তু সকলে যে তাঁর শত্রু! একদিন তো তাঁর প্রাণনাশেরই উপক্রম হলো। হযরত আবু বকর তাঁকে উদ্ধার করতে এসে নিজেও নরাধমদের হাতে ক্ষত-বিক্ষত হলেন।

ছাহাবাদের ক্ষুদ্র জামাতে ইয়াসির ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এক ছাহাবী। কোরেশ একদিন তাঁকে ও তাঁর পুত্র আম্মারকে মরুভূমির তপ্ত বালুতে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখলো। তাদের এক কথা– হয় মুহাম্মদের ধর্ম ছাড়ো, নয় ধুঁকে ধুঁকে মরো।

স্বামী ও পুত্রের এ মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে বিবি সুমাইয়া আর্তনাদ করে উঠলেন এবং পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে নরপশুদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাইলেন। ফলে নরপশুর দল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনি শহীদ হলেন। ইসলাম-সৌভাগ্য আবারো উপস্থিত হলো এক নারীর দুয়ারে। শাহাদাতের খুনঝরা ইতিহাসে প্রথম হলেন হযরত সুমাইয়া। শহীদী কাফেলার প্রথম ভাগ্যবতী হলেন বিবি সুমাইয়া।

***

জুলুম-নির্যাতনের ঘোর অমানিশা যখন আর কাটে না, মহাদুর্যোগের আঁধার রাত যখন আর পোহায় না, ভোরের আলোর প্রতীক্ষায় অধীর মানুষগুলো আর যখন পারে না, আল্লাহর নবী তখন তাঁর ছাহাবাদের পরামর্শ দিলেন, তোমরা হিজরত করো, পিতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে কোন দূর দেশে গমন করো।

হে পাঠক! কল্পনা করতে পারো সে দৃশ্য! দিনের পর দিন যাঁরা নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলো, মৃত্যু না হয়েও হাজার মৃত্যুর বিভীষিকা যাঁরা তিলে তিলে ভোগ করলো, এখন তাঁদের আবার দেশ ছাড়ার কথা! কোন্ অজানার পথে যাত্রা করবে তাঁরা! দেশে আপনজনের মাঝে যাঁদের আশ্রয় নেই, বিদেশের মাটিতে কে জানে কী হবে তাঁদের অবস্থা! সকলে যেন তাঁদের প্রিয়নবীর মুখপানে তাকিয়ে আছেন অসহায় দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির নীরব জিজ্ঞাসা নবী-হৃদয়ে কী ভাবের সৃষ্টি করেছিলো, আমাদের মতো 'জড়দেহের' মানুষের তা বোঝার কথা নয়।

তবে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন। আরো ধৈর্য ধরো, পাত্র পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করো।

হয়ত প্রিয় নবী তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাহাবাদের আরো বলেছিলেন–

দেখো, আল্লাহর এ বিশাল দুনিয়ায় তোমরা ক'জনই হলে তাওহীদ ও রিসালাতের অনুসারী, এক আল্লাহর পূজারী, সত্যের পথে আহ্বানকারী। তোমরা মানবতার আশা-ভরসা। তোমরা মানবজাতির পথের দিশা। কুল মাখলুকাতের ব্যাকুল দৃষ্টি এখন তোমাদের উপর। পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা যদি কামনা করো, ইসলাম-বৃক্ষ শিরক ও জাহেলিয়াতের ঝড়ঝাপটা বাঁচিয়ে শত শাখায় বিস্তৃত হোক, তা যদি চাও, সর্বোপরি যদি আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার আশা করো তাহলে স্বদেশ ভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরতের জন্য প্রস্তুত হও। এ বিচ্ছেদ তোমাদের জন্য যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি আমার জন্যও কষ্টদায়ক। কিন্তু তোমরা যে ভবিষ্যত মানবজাতির শিক্ষক! তোমাদের কাছেই তো যুগ যুগের মানুষ পাবে সত্যের পথে ত্যাগ ও কোরবানীর শিক্ষা!

সুদীর্ঘ নির্যাতনে বিপর্যস্ত ছাহাবা কেরামের ক্ষুদ্র দলটি প্রিয় নবীর মুখনিসৃত সান্ত্বনাবাণীর সুশীতল পরশে সেদিন যেন নবজীবন লাভ করলো। তাই সব কিছু ত্যাগ করে, এমন কি প্রিয়তম নবীর সান্নিধ্য বিসর্জন দিয়ে তাঁরা হাসিমুখে আল্লাহর পথে হিজরত করলেন। যে পথের ধূলিকণা এই মুহাজির কাফেলার পদ-স্পর্শ লাভ করেছে ধন্য তারা, ধন্য তাদের ধূলি-জীবন। আর যারা এই পুণ্যাত্মাদের দেশ ছাড়া করেছে ধিক

তাদের মানবজীবন।

নবীর অনুসারী ছাহাবীদের সংখ্যা তখন কতই বা ছিলো? সম্ভবত পঁচিশের বেশী নয়। কিন্তু কী অতুলনীয় তাদের আত্মত্যাগ! কী অপূর্ব তাদের নবীপ্রেম! এমন আত্মত্যাগ ও প্রেম নিবেদনের তুলনা কি পাবে তুমি মানবজাতির ইতিহাসে! ধন্য আরব নবীর উম্মত! ধন্য তাঁদের নবী প্রেম!

অতি সামান্য পাথেয় সম্বল করে এই মুহাজির কাফেলা অজানার পথে যাত্রা শুরু করলো। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং নবীর আশীর্বাদ হলো তাঁদের পাথেয়, তাঁদের পথের সম্বল। জুলুম-নির্যাতনের বিভীষিকা থেকে মুক্তির আনন্দ এবং নতুন দেশে নিরাপদ জীবন লাভের সম্ভাবনা একদিকে তাঁদেরকে পথ চলার উদ্যম এবং সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার সাহস যোগাচ্ছিলো, অন্যদিকে বিভিন্ন শংকা ও আশংকা এবং ঝড় ঝাপটা যেন তাঁদের আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিতে উদ্যত ছিলো। তবু তাঁদের পথ চলা অব্যাহত ছিলো। দিনের আলো ও রাতের অন্ধকার এবং মরীচিকার ঝিকিমিকি ও তারকার ঝিলিমিলির মাঝে অদৃশ্যলোকের একটি আলোক রেখা যেন তাঁদের পথ দেখিয়ে চলেছিলো। এভাবে মরুভূমির বালু-সাগর এবং নোনা দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে মুহাজির কাফেলা গিয়ে পৌঁছলো হাবশা দেশে।

***

হাত ফসকে যাওয়া মুসলমানেরা অন্য দেশে দ্বীন ও ঈমান নিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করবে, এমন কল্পনাও মক্কার কোরেশদের জন্য ছিলো অসহনীয়। কেননা মুসলমানদের জীবনে শান্তির সুবাতাস মানে তো কোরেশদের জীবনে অশান্তির দাবানল। এখানে ভোরের সোনালী আলোর উদ্ভাস মানে তো সেখানে অমাবস্যার অন্ধকার। তাই মুহাজিরদের দেশ ত্যাগের খবর জানাজানি হওয়ামাত্র কোরেশ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু আল্লাহর রহমত এবং নবীর দরদ যাঁদের সঙ্গী তাঁদের ভাবনা কিসের! ধাওয়াকারীদের থাবা এড়িয়ে নিরাপদেই তাঁরা পৌঁছে গেলো হাবশার রাজধানীতে। কোরেশ তখন কূটনৈতিক পথে অগ্রসর হলো এবং মূল্যবান

উপঢৌকনসহ দু'জন সুচতুর ব্যক্তিকে নাজ্জাশীর রাজদরবারে পাঠালো। তারা প্রভাবশালী দরবারীদের হাত করে রাজসমীপে এই মর্মে আর্জি পেশ করলো–

'মহারাজ! আমরা পবিত্র তীর্থভূমি মক্কার বাসিন্দা। মুসলিম পরিচয়দানকারী আমাদের কিছু ধর্মচ্যুত লোক পালিয়ে এসেছে আপনার রাজ্যে। মহারাজের আজ্ঞা হলে আমরা তাদের ফিরিয়ে নিতে চাই।'

তারা আরও অভিযোগ করলো যে, পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে এক নতুন ধর্ম এরা উদ্ভাবন করেছে এবং ঘরে ঘরে বিভেদ ও অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

লোভের জলে এবং উপঢৌকনের জালে আটকা পড়া দরবারীরা তাদের কথায় সায় দিয়ে বললো, ধর্ম ত্যাগকারীদেরকে তাদের অভিভাবকদের হাতে পত্যার্পণ করাই উত্তম।

কিন্তু বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা নাজ্জাশী বললেন–

'একতরফা অভিযোগে আমি কোন আদেশ জারি করতে পারি না। আমার আশ্রিতদের বক্তব্য না শুনে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। এত বড় অন্যায় ও অধর্ম আমার দ্বারা হতে পারে না।

তাছাড়া সাধারণ যুক্তিতেও তোমাদের দাবি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, তারা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আমার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কেননা স্বেচ্ছায় কেউ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে না।

ঘটনা যাই হোক এবং আমার আশ্রিতদের ধর্ম-পরিচয় যাই হোক, আমি তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ করবো, তারপর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবো।'

পরদেশের মাটিতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে মুহাজির কাফেলায় রাজতলব হাজির হলো। ফলে স্বভাবতই তাঁরা উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়লো। কে জানে আবার কোন বিপদ দেখা দিলো! হে আল্লাহ! তোমার বিশ্বরাজত্বে এমন কোন ভূখণ্ড কি নেই যেখানে আমরা পেতে পারি একটু নিরাপদ আশ্রয়! প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মরুভূমি ও সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু হায়, এখনো যে

আমরা ঠিকানাহীন মুসাফির!

হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের রক্ষা করো, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করো। আমরা যে তোমারই নবীর অনুসারী, সত্য পথের পথিক! তুমি ছাড়া আমাদের কোন আশ্রয় নেই, কোন সহায় নেই।

মুহাজিরগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে রাজ দরবারে হাজির হলেন। কোরেশপ্রতিনিধিদ্বয় রাজা নাজ্জাশীকে সিজদা করে বিনয়ের সাথে এক পাশে দাঁড়ালো। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা, মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হতে পারে না। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করতে পারে না। তাই মুহাজিরগণ রাজা নাজ্জাশীকে শুধু সালাম করলেন। দরবারীগণ সুযোগ পেয়ে বলে উঠলো, তোমরা তো অদ্ভুত হে! রাজদরবারের শিষ্টাচার রক্ষা করতে জানো না। যাঁর আশ্রয়ে জীবন বাঁচাতে চাও সেই মহামান্য সম্রাটকে সিজদা করতে তোমাদের কিসের আপত্তি!

গাম্ভীর্য ও প্রশান্তির মূর্ত প্রতীক রাজা নাজ্জাশী কিন্তু দরবারীদের বাকচাতুর্যে প্রভাবিত হলেন না। তিনি শুধু স্মিত হেসে মুসলিম দলপতিকে সম্বোধন করে বললেন, এ অভিযোগের জবাব কি তোমার?

(আলী ভ্রাতা) হযরত জাফর বিন আবু তালিব ছিলেন মুহাজিরদের দলপতি। তিনি সাবলীল ভঙ্গিতে অগ্রসর হলেন এবং মার্জিত ভাষায় বললেন–

'বাদশাহ! ঔদ্ধত্য প্রকাশ কিংবা অবজ্ঞা প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়! বরং আমাদের নবীর শিক্ষা এই যে, সমগ্র বিশ্বজগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, রাজা-প্রজা সকলের মাথা তাঁর সামনেই শুধু সিজদাবনত হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা– যত ক্ষমতাবানই হোন, যত ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালুই হোন– মানুষের সিজদা লাভের অধিকারী নন। আমরা আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ও দয়ালু বলে জানি। সে জন্যই আমাদের নবী আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিতে বলেছেন। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্যও আমরা তাঁর শিক্ষা অমান্য করতে পারি না।'

খৃস্ট ধর্মের অনুসারী সম্রাট নাজ্জাশী মুসলিম দলপতির স্পষ্ট ভাষণে অভিভূত হলেন এবং সাগ্রহে বললেন–

'আল্লাহর প্রেরিত বলে যাঁর নাম তোমরা উচ্চারণ করলে তাঁর পরিচয় ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানতে চাই।'

নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে দলনেতা জাফর অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় বললেন–

'মহামান্য বাদশাহ! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা ছিলাম পশুর চেয়ে অধম এক কওম। মুর্দা গলিজ ছিলো আমাদের খাদ্য। পাথর ও মূর্তি ছিলো আমাদের উপাস্য। অশ্লীলতা ও পাপাচার ছিলো আমাদের মজ্জাগত। নিষ্ঠুরতা ছিলো এমন যে, নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে আমরা জীবন্ত কবর দিতাম। তার আর্তচিৎকারে আমাদের মন গলতো না, চোখের পাতা ভিজতো না। এক কথায় ভয়ংকর এক অন্ধকারে ডুবেছিলাম আমরা। এমন সময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদের ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, ইনসানিয়াত ও মানবতা শিক্ষা দিলেন। আমরা পশু থেকে মানুষ হলাম। অন্যায় ও মন্দ বর্জন করে ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হলাম। মূর্তিপূজার পরিবর্তে এক আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করলাম। আমরা মানুষকে ভালোবাসি, মানুষের উপকার করি, মানুষকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে ডাকি।

বাদশাহ মেহেরবান! এই হলো আমাদের অপরাধ। এ কারণেই স্বজাতির হাতে আমরা এমন হিংস্রতা ও বর্বরতার স্বীকার হলাম যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রাণ বাঁচাতে আমরা আজ আপনার আশ্রয়প্রার্থী। কিন্তু আমাদের কওম এখানেও এসে হাজির হয়েছে, জুলুম-নির্যাতনের বিভীষিকায় আবার আমাদের ফিরিয়ে নিতে।

বাদশাহ মেহেরবান! স্বদেশেই আমরা আপনার মহানুভবতার কাহিনী শুনেছি। আমাদের নবী বলেছেন, আপনি বড় রহমদিল। তাই আপনার রাজ্যে আমরা এসেছি আপনার আশ্রয় প্রত্যাশী হয়ে।'

মুসলিম দলনেতার বক্তব্যে বাদশাহ নাজ্জাশী আশ্বস্ত হলেন এবং মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতন ভোগের কাহিনী শুনে ব্যথিত হলেন। তিনি তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে বললেন–

'সত্যের জন্য তোমরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছো তা অতুলনীয়। আমি সুনিশ্চয় ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঈসা বিন মারয়ামের সুসংবাদ যাঁর সম্পর্কে, তিনি তোমাদের নবী মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন। হায়, রাজত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে যদি আবদ্ধ না হতাম তাহলে মক্কায় গিয়ে সেই মহান নবীর পদ চুম্বন ও পাদুকা বহন করে আমি ধন্য হতাম। আমার অন্তর্দৃষ্টি বলছে, হেরা পর্বতের নূর-তাজাল্লি নিঃসন্দেহে সিনাই পর্বতের নূর-তাজাল্লিরই পূর্ণতম প্রকাশ।'

বস্তুতঃ অন্তরের উপলব্ধি ও বিশ্বাসের দিক থেকে রাজা নাজ্জাশী তখনই ইসলামের সত্যতায় আত্মসমর্পিত হলেন, তবে পরিস্থিতি হিসাবে তা প্রকাশ না করাই উত্তম বিবেচনা করলেন। অবশ্য কোরেশ-প্রতিনিধিদ্বয়কে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, আমার আশ্রিতদের আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। ফলে তারা ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় করে মক্কায় ফিরে গেলো।

***

মক্কার মুশরিকদের পাশবিক নির্যাতনের কবল থেকে অসহায় ছাহাবাদের রক্ষার তাগিদেই হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাবশায় হিজরতের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেননা নির্যাতন ও নিপীড়নের নারকীয় দৃশ্য নীরবে অবলোকন করে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু নির্যাতিত মুসলমানরা যখন হাতছাড়া হয়ে গেলো এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনার সকল অপচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর মুশরিকদের ক্রোধানল বর্ষিত হতে লাগলো। কখনো গালমন্দ করে, কখনো টানা-হেঁচড়া করে, আবার কখনো তাঁর পাক বদনে গলিজ আবর্জনা নিক্ষেপ করে তারা তাদের মনের ঝাল মেটাতে লাগলো। এমন কি দৈহিক নির্যাতন পর্যন্ত বাদ দিলো না নরাধমেরা। মানবতার দরদী বন্ধু 'মানব-পশুদের' হাতে এভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করলেন দিনের পর দিন। শেষ পর্যন্ত জন্মভূমি মক্কায় টিকে থাকাই তাঁর পক্ষে অসম্ভ হয়ে পড়লো। তবু

তিনি ছিলেন জাবালে হেরা ও জাবালে ছাফার মতো অটল, কিংবা বলো, সুউচ্চ হিমালয়ের মতো স্থির অবিচল।

মানবতার মহামুক্তির আকুতি নিয়ে 'উম্মী' কওমের উম্মী নবী তাঁর পথ চলা অব্যাহত রাখলেন। মক্কার বিভিন্ন মজলিসে এবং বিভিন্ন পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে গিয়ে– 'এসো হে মানব! সত্যের পথে, লা শারীক আল্লাহর পথে' এই ডাক দিতে থাকলেন। অসংখ্য পশুর ভিড়ে একজনও মানুষ যদি পাওয়া যায়, যার কর্ণ সত্য শ্রবণ করবে এবং অন্তর ঈমান গ্রহণ করবে!

মানব প্রেমের কী আশ্চর্য আকুতি! সত্য প্রতিষ্ঠার কী অপূর্ব প্রতীতি। স্রষ্টার প্রেমে যিনি পূর্ণ স্নাত হয়েছেন এবং সৃষ্টির কল্যাণে যিনি পূর্ণ নিবেদিত হয়েছেন, সর্বোপরি যিনি আল্লাহর আদেশ লাভ করেছেন এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর পক্ষেই শুধু সম্ভব এমন ঊষর মরুতে এমন পাষাণ হৃদয়ে ঈমান ও তওহীদের বীজ বপনের এমন মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং অবশেষে এমন অভাবিতপূর্ব সাফল্য অর্জন করা।

***

কোরেশদের জুলুম-অত্যাচার এবং নবী মুহাম্মদের তাবলীগ ও সত্য প্রচার সমান গতিতেই চলতে লাগলো! বরং জুলুমের মাত্রা যত বাড়ে প্রিয় নবীর দাওয়াতি জযবা ও সত্য প্রচারের স্পৃহা যেন তারচে' বহু গুণ বৃদ্ধি লাভ করে। তখন একদিন চরম সিদ্ধান্তের জন্য সমগ্র কোরেশ গোত্রের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ পরামর্শ মজলিসে মিলিত হলো। ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় তাদের তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থা। সকলের মুখে একই কথা– ধিক, এ জীবনের প্রতি শত ধিক! এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তো শ্রেয়! মক্কায় কি নেই এমন কোন বীর জোয়ান, যে আমাদের উপাস্যদের রক্ষা করতে পারে এবং সমুন্নত রাখতে পারে কোরেশের ধর্ম-মর্যাদা ও গোত্র-গৌরব! নেই কি এমন ধারালো তলোয়ার যা মরুর তপ্ত বালুতে লুটিয়ে দিতে পারে মুহাম্মদের শির!

এ ধরনের গরম গরম কথার মাঝে মূর্খের সেরা আবু জাহল ঘোষণা করে বসলো, মুহাম্মদের কল্লা আনবে যে, তার পুরস্কার হবে একশ' লাল

উট আর এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা।

কোরেশের টগবগে জোয়ান ওমর বিন খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে উদ্ধত কণ্ঠে ঘোষণা দিলো, চললাম আমি মাথা কেটে আনতে। আজকের সূর্যাস্ত লাল হবে আমার কিংবা মুহাম্মদের খুনে।

ওমরের ঘোষণায় কোরেশ সরদারদের হতাশ মনে আশার সঞ্চার হলো। কেননা ওমর হলো আরবের সেরা বীর। সমগ্র মক্কায় বীর ওমরই এ অভিযানের একমাত্র যোগ্য। সুতরাং মুহাম্মদের প্রাণনাশ অবধারিত।

কাবাঘর তাওয়াফ করে মূর্তির গা ছুঁয়ে শপথ করে খোলা তলোয়ার হাতে ওমর বের হলেন তার 'অভিযানে'। ওমরের তখন সে কী রুদ্রমূর্তি! তাকে রুখে সাধ্য কার!

দেখো পাঠক, মানবের মূর্খতা দেখো। সত্যের বাণী প্রচারের, স্রষ্টার প্রেম ও দয়া বিতরণের এই হলো পুরস্কার! আমেনার পুত্র মুহাম্মদ আল-আমীনের এই হলো প্রতিদান! এমন নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করেই হয়ত কবি বিলাপ করেছেন–

'আমার বুকের খুনে লাল হলো ওদের তলোয়ার।
তোমার প্রেমে আত্মনিবেদনের এই তো পুরস্কার।
প্রাসাদ বেলকনীতে এসে দাঁড়াও বন্ধু!
দেখে যাও তামাশা চমৎকার।'

পথে যুবক ওমরের পরিচিত এক বন্ধু পথরোধ করে জিজ্ঞাসা করলো– বন্ধু, কেন এ সংহার মূর্তি তোমার! কোন্ মায়ের বুক খালি করবে আবার!

যুবক ওমর সগর্বে তার অভিযানের কথা প্রকাশ করলেন। ওমরের বন্ধু ছিলেন গোপনে মুসলিম। তিনি কৃত্রিম নির্লিপ্ততার আড়ালে তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চেপে রেখে বললেন–

'কিন্তু ঘরের খবর রাখো! আমরা যে শুনেছি, তোমার ঘরেও ইসলাম ঢুকে পড়েছে! বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে বসে আছে! তাই বলি বন্ধু! আগে ঘর সামলাও, তারপর অন্য কাজে মাথা ঘামাও।

যুবক ওমর এমনিতেই ক্রোধে টগবগ করছিলেন, এবার যেন তার মাথায় বজ্রপাত হলো। সেখান থেকেই সোজা বোনের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। বদ্ধ দরজায় ওমরের আওয়াজ পেয়ে বোন ফাতেমা বিচলিত হলেন। নিজের চেয়েও তার বেশী চিন্তা হলো ছাহাবী খাব্বাব সম্পর্কে, যিনি তাকে ও তার স্বামীকে কোরআন শিক্ষা দিতে তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। ফাতেমা ভাবলেন, যা কিছু হোক রক্তের সম্পর্ক ওমরকে আমার বিষয়ে সংযত রাখবে। কিন্তু খাব্বাবকে দেখামাত্র তার মাথায় খুন চেপে যাবে। এরপর যা ঘটবে তা কল্পনা করতেও শরীর কন্টকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন নাযুক মুহূর্তেও স্থিরমতী ফাতেমা খাব্বাবের আত্মগোপনের নিরাপদ ব্যবস্থা করলেন। তারপর ধীরস্থিরভাবে দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। ওমর ঘরে ঢুকলেন যেন যমদূতের মতো। তার লাল চোখ দেখে বোন ফাতেমা বুঝে নিলেন, শাহাদাত-সৌভাগ্যের শুভলগ্ন সমুপস্থিত। সুতরাং ভয় পাওয়া কেন আর! তাই ওমর যখন গজবের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কথা কি সত্যি যে, তোরা ইসলাম গ্রহণ করেছিস? তখন তিনি ধীর শান্ত ভাষায় বললেন—

'প্রিয় ভাই! তোমার আমার মাঝে তলোয়ারের ভাষায় কথা হবে, কল্পনা করিনি কখনো। তবু বলছি শোনো, বোনের রক্ত যদি তোমার এতই প্রয়োজন হয় তা হলে এই নাও মাথা পেতে দিলাম। আমাকে হত্যা করো, তোমার রক্তের পিপাসা নিবারণ করো।'

ঘটনার আকস্মিকতায় ওমর হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। আজীবন তিনি তলোয়ারের খেলা খেলেছেন। আঘাত হেনেছেন এবং আঘাত ফিরিয়েছেন, কিন্তু এমন অভিনব আঘাতের জন্য তো তিনি প্রস্তুত ছিলেন না! ভাইয়ের হতবিহ্বলতার সুযোগে বোন ফাতেমা অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় বললেন—

'আর যদি আমার একটি মিনতি রক্ষা করো তাহলে শোনো, উদ্দেশ্যহীন পথে জীবনের আর অপচয় করো না। জ্ঞানী বলেই জানি তোমাকে। সুতরাং জ্ঞানের পথ ধরে চলো এবং সত্যের ডাকে সাড়া দাও।'

আল্লাহ জানেন, অন্তরের কী দরদ ব্যথা ছিলো ভাইয়ের প্রতি বোনের এই মিনতিতে! ওমর উঁচিয়ে ধরা তলোয়ার নামিয়ে নিলেন, 'সর্পরাজ'

যেমন উদ্যত ফণা নামিয়ে ফেলে মন্ত্রের আবেশে। তবে মুখের তেজ বজায় রেখে বললেন, কি বলতে চাও তুমি?

ফাতেমা বললেন, 'ভাই! মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা তোমার বিচারে যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। এ জন্য যে কোন শাস্তি গ্রহণে আমি প্রস্তুত। কিন্তু যে আসমানী কালাম আমাদের জীবনের গতিধারা পরিবর্তন করেছে, আমাদের চলার পথে সত্যের আলো জ্বেলেছে, আমি চাই সে পাক কালাম তুমিও পড়ে দেখো একবার। আর কতকাল ডুবে থাকবে মূর্খতার অন্ধকারে?

মুগ্ধ, অভিভূত চিত্তে ওমর বোনের বক্তব্য শুনলেন, আর ভাবলেন, কোথায় পেলো এ অবলা নারী এমন আশ্চর্য শক্তি! উদ্ধত তরবারির নীচে এমন মৃত্যুভয়হীন ও প্রশান্তিপূর্ণ মুখাবয়ব কল্পনা করাও যে অসম্ভব! বিশ্বাসের প্রতি এমন দৃঢ়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি এমন অবিচলতা, সর্বোপরি মানবের প্রতি এমন দরদ-ব্যথা ও কল্যাণ-আকুতি– এসবের পিছনে কী রহস্য নিহিত! কী আছে ঐ কালামে! ক্ষতি কি একবার পড়ে দেখতে!

এ সকল ভাবনায় আচ্ছন্ন ওমর এবার কিছুটা মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, দাও, পড়ে দেখি তোমার কোরআন।

উদ্ধতস্বভাব ওমরের মনোভাবের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে বোন ফাতেমার অন্তরে আশা আনন্দের এক অপূর্ব ঢেউ খেলে গেলো। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর কালাম তো অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না, পড়তে হলে পবিত্র হয়ে এসো।

আশ্চর্য! ওমরের মতো উদ্ধত স্বভাবের কোরেশ যুবক কোন প্রতিবাদ করলেন না। গোসল করে পবিত্র হলেন। দেহের পবিত্রতা বুঝি বা হৃদয়কেও স্পর্শ করলো। দুরু দুরু বুকে তিনি হাত বাড়ালেন। বোন ফাতেমা এগিয়ে দিলেন 'সূরা ত্বাহা'-এর সেই অংশটি যা তিনি ও তাঁর স্বামী, খাব্বাবের নিকট পড়ছিলেন। একজন বোনের অন্তরে যতটুকু কল্যাণ-আকুতি থাকতে পারে ততটুকু আকুতি নিয়ে আল্লাহর নিকট তিনি নীরব প্রার্থনা জানালেন–

'হে পরম প্রতিপালক! মানুষের হৃদয় তোমার হাতে, তোমারই নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং সত্যের জন্য ওমরের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দাও। কবুল হওয়ার মত কোন প্রার্থনা যদি আমার থাকে তাহলে জীবনের এই একমাত্র প্রার্থনা কবুল করো হে আল্লাহ!'

ওমর ততক্ষণে তেলাওয়াত শুরু করেছেন। আর ফাতেমা দু'চোখে আশা ও প্রত্যাশার সুগভীর ব্যাকুলতা নিয়ে তার মুখ পানে তাকিয়ে আছেন। মুখের আয়নায় অন্তরের প্রতিফলন বোঝার চেষ্টা করছেন।

ওমর একটি করে আয়াত তেলাওয়াত করছেন, আর সত্যের অরুণোদয় যেন ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়াকাশ আলোকোদ্ভাসিত করে চলেছে।

'ত্বা-হা'! তুমি হতভাগ্য হবে, সেজন্য তো কোরআন নাযিল করিনি। এ তো আমাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য স্মারক। যিনি ভূমণ্ডল ও সুউচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, এ তো তাঁরই অবতারিত। রহমান আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং উভয়ের মধ্যস্থল্লে, আর পাতাল-তলের যা কিছু সব তাঁরই মালিকানা। তুমি যদি সশব্দে বলো, তবে তিনি তো গোপনতম বিষয়ও অবগত। আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। তাঁরই জন্য সুন্দর নামসকল।'

'কেয়ামতকাল অবশ্যম্ভাবী, আমি তা অজ্ঞাতই রাখবো যেন প্রত্যেক মানব আপন কৃতকর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে দুর্ভাগা তা অবিশ্বাস করেছে এবং প্রবৃত্তিতাড়িত হয়েছে, অতঃপর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে– সে যেন তোমাকে সত্যবিমুখ করতে না পারে।'

হায় পাঠক! যে ভাষায় এ কালাম নাজিল হয়েছে তার অলৌকিকত্ব ও ঐশী সৌন্দর্য তুমি যদি কিছুমাত্র অনুভব করতে পারতে তাহলে বুঝতে, কেন বলা হয়েছে–

'যদি এ কোরআন কোন পর্বতের উপর আমি নাযিল করতাম তাহলে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে তা ফেটে গেছে।'

সুতরাং হৃদয় যতই পাষাণ হোক এবং চিন্তা ও বিবেক যতই মুরদা হোক, এরপরও কি মানুষ কোরআনের মহাসত্য থেকে বিমুখ থাকতে

পারে! ওমরের পাষাণ হৃদয় নরম হলো, বিগলিত হলো। মহাসত্যের সামনে তিনিও অবনত হলেন, আল-কোরআনের হাতছানিতে তিনিও সাড়া দিলেন। স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে ওঠা মানুষের মত তিনি বলে উঠলেন, এ তো মানুষের কথা নয়, আল্লাহর কথা। আমাকে নিয়ে চলো তাঁর খিদমতে, আমি আশ্রয় চাই তাঁর পাক কদমে।

বোন ফাতেমার আনন্দের কথা কী আর বলবো! প্রিয় পাঠক, যতদূর পারো তুমি শুধু কল্পনা করো।

আত্মগোপন করে খাব্বাব সবকিছু দেখছিলেন, শুনছিলেন। এবার তিনি 'মারহাবা, মারহাবা' বলে বেরিয়ে এলেন এবং ওমরকে সুসংবাদ দান করে বললেন–

'ওমর, সত্যের পথে তোমার যাত্রা মোবারক হোক। প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার হিদায়াতের জন্য দু'আ করেছিলেন।'

আগামী দিনের ওমর আল-ফারূক তখন নতুন বেশে, নতুন উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন দারুল আরকামে, যেখানে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাহাবা কেরামকে দ্বীন ও তাওহীদের শিক্ষা এবং আবদিয়াত ও ইনসানিয়াতের দীক্ষা দান করছিলেন।

নূরানী চেহারার অল্প ক'জন মানুষ নূরনবীর পবিত্র মুখে ঐশীবাণী শ্রবণ করছিলেন, এমন সময় বদ্ধ দরজায় ওমরের আওয়াজ পেয়ে সকলে শংকিত হলেন– তবে তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় নয়, প্রাণপ্রিয় নবীর অমঙ্গল আশংকায়। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরম প্রশান্তির সাথে অগ্রসর হলেন এবং দরজা খুলে দিলেন, যেন এতক্ষণ এ আওয়াজের ইন্তিজারেই ছিলেন তিনি।

ধীর পদক্ষেপে অবনত মস্তকে ওমর ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আদবের সাথে এক পাশে দাঁড়ালেন। নূরনবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বুকে হাত রেখে শুধু বললেন, ওমর! আর কতকাল হোঁচট খাবে মিথ্যার অন্ধকারে?

লজ্জায় ও অনুতাপে ওমর যেন মাটির সাথে মিশে যাবেন। হযরতের

সুমধুর তিরস্কারে ওমরের হৃদয়ে এমন অপূর্ব ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি হলো যে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেলো। স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন পবিত্র কালিমা– আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ....

বস্তুত হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ মক্কার মুশরিকদের জন্য যেমন ছিলো এক প্রচণ্ড আঘাত তেমনি মুসলমানদের জন্য ছিলো অশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ। কেননা প্রকৃত অর্থেই ইসলামের ইতিহাস নতুন মোড় নিয়েছিলো সেদিন।

এর কিছুদিন পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতৃব্য হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সম্পর্কে মুরুব্বী হলেও সমবয়সের সুবাদে উভয়ের মাঝে অন্য রকম একটা হৃদ্যতা বিদ্যমান ছিলো। হামযা তাঁকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন। হামযা ছিলেন সৌখীন শিকারী। নিয়মিত শিকার ভ্রমণে বের হতেন।

এক সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফিরে দাসীর মুখে তিনি শুনলেন, তাঁর প্রিয় ভাতিজা মুহাম্মদ, আবু জেহেলের হাতে অপদস্থ হয়েছেন। হামযাকে ধিক্কার দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দাসী বললো, মুত্তালিব পরিবারের মর্যাদা কি ধূলায় লুণ্ঠিত হবে? আপন বলতে কেউ কি নেই মুহাম্মদের? আবু জেহেলের সব কটুক্তি কেন তাঁকে নীরবেই হজম করতে হলো আজ!

দাসীর মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে হামযা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

কী, এতো বড় আস্পর্ধা! আমি বেঁচে থাকতে মুহাম্মদ অপদস্থ হবেন! কেন, কী তার অপরাধ? তিনি আপন ধর্মমত প্রচার করছেন, কোন অন্যায় তো করেননি। তাঁর মতো পূতপবিত্র চরিত্রের দ্বিতীয় আরেকজন কে আছেন আরবের বুকে! অথচ তিনি লাঞ্ছিত হবেন আবু জেহেলের মতো লোকের হাতে!

বীর হামযা ধনুক হাতে তখনই ছুটে গেলেন কাবাচত্বরে। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন আবু জেহেলের উপর। গর্জন করে বললেন–

আমার ভাতিজাকে গালমন্দ করো, এতো বড় আস্পর্ধা তোমার? অথচ

সে যা বলে আমিও তাই বলি। সাহস থাকে তো আমার সামনে মুখ খোলো দেখি!

প্রিয় পিতৃব্যের ইসলাম গ্রহণে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের স্মরণীয় আনন্দ লাভ করলেন। আবু জেহেলের দুর্ব্যবহার যেন আল্লাহর রহমত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এলো। তাই তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

ওমর ও হামযা– এ দুই কোরেশবীরের পরপর ইসলাম গ্রহণের ফলে নিপীড়ন-নির্যাতনে বিপর্যস্ত মুসলমানদের ক্ষুদ্র জামাত যেন কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সুযোগ পেলো। কেননা হামযার আভিজাত্য এবং ওমরের বীরত্ব ছিলো কেরেশে সর্বস্বীকৃত।

হযরত ওমর একদিন প্রিয় নবীর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি হক ও সত্যের অনুসারী হয়ে থাকি তাহলে কাফিরদের ভয়ে কেন আত্মগোপন করে থাকা! ওদের অধর্ম চলবে প্রকাশ্যে, আর আমরা আল্লাহর ইবাদত করবো লুকিয়ে? এ অসহ্য ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি করুন, কাবাঘরের সামনে আমরা প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করি।

বীর ওমরের এ সাহসী আবদার সন্তুষ্টচিত্তেই মঞ্জুর করলেন আল্লাহর রাসূল।

দুই কাতারের অগ্রভাগে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ওমর ও হামযা অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং কাবাচত্বরে উপস্থিত হয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করলেন। ওমর-হামযার তলোয়ারের মুখে কারো সাহস হলো না মুখ খোলার কিংবা হাত তোলার। বস্তুত সেদিনই মুসলমানগণ একটি নতুন জাতি ও একটি নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অবশ্য প্রতিহিংসার আগুন তাতে আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এবং নির্যাতন ও নিপীড়ন আরো ভীষণ রূপ ধারণ করলো।

***

হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আপন গোত্র বনু হাশিমের সকলে মুসলমান না হলেও তাঁর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল

ছিলেন। তাই হাশেমী মুহাম্মদ অন্য কোন গোত্রের হাতে নিগৃহীত হবেন, এটা ছিলো তাদের জন্য অসহনীয়। অন্যদিকে কোরেশের অন্যান্য শাখা হাশেমীদের 'মুহাম্মদ-প্রীতি' সহজভাবে মেনে নিতে পারছিলো না। ফলে আলোচনা-সমালোচনা ও বাকবিতণ্ডার পর্যায় গড়িয়ে তা গোত্রীয় কলহের রূপ নিলো এবং সম্মিলিত কোরেশ হাশেমীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কট ঘোষণা করলো।

অনন্যোপায় হয়ে হাশেমী পরিবার তখন নিকটবর্তী পর্বত অধিত্যকায় আশ্রয় নিলো। এজন্য পরবর্তীতে তা 'আবু তালিব অধিত্যকা' নামে পরিচিত হয়েছে।

কোরেশের সকল শাখা এ মর্মে একটি সর্বসম্মত চুক্তিপত্র তৈরী করলো যে, হাশেমীরা মুহাম্মদকে যতদিন ছত্রচ্ছায়া দান করবে ততদিন হাশেমীদের সাথে যাবতীয় লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হলো। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধেও বয়কট কার্যকর হবে। চুক্তিপত্রটির উপর ধর্মীয় মর্যাদা আরোপ করার জন্য তা কাবাগৃহে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

বলাবাহুল্য যে, কোরেশের এ বয়কট শাব্দিক অর্থেই হাশেমী পরিবারের জীবন যাত্রা ও অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব করে দিয়েছিলো। একদানা গম কিংবা এক কাতরা পানিও তাদের কাছে পৌঁছার উপায় ছিলো না। ফলে ক্ষুধা-পিপাসায় তাদের প্রাণ হলো ওষ্ঠাগত। এমন কি গাছের ছালপাতা চিবিয়েও জীবন ধারণ করতে হয়েছে কখনো কখনো। শিশু ও নারীদের অবস্থা ছিলো সবচে' করুণ। তাদের আর্তচিৎকারে পাথরও বুঝি গলে যায়, কিন্তু কোরেশের পাষাণ হৃদয় গলে না।

কোরেশের অপকৌশল ছিলো এই যে, বয়কটের ফলে হাশেমী পরিবার বাধ্য হয়ে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পরিত্যাগ করবে, কিন্তু জীবন বিপন্নকারী বিপদ-দুর্যোগের মুখেও হাশেমীগণ যে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ না করেও রক্তসম্পর্কের মর্যাদা যেভাবে রক্ষা করেছে তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

দিনের পর দিন বয়কট অব্যাহত ছিলো এবং ক্রমশ তা কঠিন হতে

কঠিনতর রূপ ধারণ করছিলো। কিন্তু হাশেমী পরিবার তাদের শেষ শিশু সন্তানটির মৃত্যু পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদকে রক্ষার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলো। অবশেষে দু'একটা পাষাণ হৃদয় কিছুটা নরম হলো। নারী ও শিশুর আর্তচিৎকার দু'একজনকে বিচলিত করলো। হিশাম নামক এক সাহসী সরদার সত্যভাষণে অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন, এই কি আমাদের আরবীয় আভিজাত্যের নমুনা! হাশেমী শিশুরা ক্ষুধা ও পিপাসায় ছটফট করবে, অথচ আমরা নির্বিকার বসে থাকবো, এ কোন ধর্ম? কী অপরাধ তাদের? আমি জানতে চাই, কবে শেষ হবে এ অমানবিক শাস্তির মেয়াদ?

হিশামের এই সাহসী সমালোচনার পর আরো দু'একজন মুখ খুললেন। তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হলো হিশামের বক্তব্য। এভাবে বিরূপ সমালোচনা ক্রমশ জোরদার হলো। এমতাবস্থায় একদিন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবু তালিব কোরেশ নেতাদের বললেন–

'দেখো, মুহাম্মদ বলছে, আল্লাহ ও মুহাম্মদ শব্দ দু'টি ছাড়া তোমাদের পুরো চুক্তিপত্র নাকি পোকায় কেটে ফেলেছে। মুহাম্মদের কথা সত্য হলে এ আযাব থেকে আমাদের মুক্তি দাও। আর সত্য না হলে তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো।'

চুক্তিপত্র নামিয়ে দেখা গেলো, ঘটনা সত্য। তখন হিশাম ও অন্যান্য উৎসাহী লোকেরা চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে আবু জেহেলকে সাফ জানিয়ে দিলো, এ অন্যায় চুক্তি মেনে চলতে আমরা বাধ্য নই। দুষ্কর্মা আবু জেহেলের তখন নতি স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। এভাবে সুদীর্ঘ তিন বছর পর বয়কটবিভীষিকার অবসান হলো।

***

এ ঘটনার কিছু দিন পর বিবি খাদিজা মৃত্যুবরণ করলেন। এটা ছিলো হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনের কঠিনতম শোকাঘাত। কেননা ইনি তো সেই খাদিজা, হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় যিনি স্বামী মুহাম্মদের খাবার বয়ে নিতেন এবং নবী মুহাম্মদকে সান্ত্বনাবাণী শোনাতেন। 'আপনাকে বিশ্বাস করি' বলে জগতের বুকে সকলের আগে তাঁকে নবীরূপে যিনি বরণ করেছিলেন, ইনি তো সেই খাদিজা! প্রিয়তম

স্বামীর সেবায় আপন অর্থ-সম্পদ ও জীবন-সম্পদ যিনি উৎসর্গ করেছিলেন, ইনি তো সেই খাদিজা!

মোটকথা, আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে এক আদর্শ জীবনসঙ্গিনী দান করেছিলেন, আবার তিনিই তাঁকে তুলে নিলেন। এমন জবিনসঙ্গিনীর মৃত্যুতে তিনি শোক-কাতর হবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি? বরং তিনি তো তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় আজীবন দগ্ধ হয়েছেন। অশ্রুসজল চোখে বার বার তাঁকে স্মরণ করেছেন। এমন কি হিজরতের সময়ও হযরত খাদিজার কবরের কথা তাঁর মনে পড়েছিলো। আল্লাহর নিকট বিবি খাদিজার মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যে চারজন নারী আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন তাঁরা হলেন হযরত ঈসার মাতা বিবি মরয়াম, ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা ও তাঁর কন্যা বিবি ফাতেমা।

বিশ্বনিয়ন্তার অপার রহস্যলীলা বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রিয়তমকে বিপদের উপর বিপদ এবং শোকের উপর শোক কেন দান করেন তা তিনিই জানেন। দেখো, বিবি খাদিজার মৃত্যু শোকের উপশম না হতেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য আবু তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হলো। সেই আবু তালিব যিনি পিতা ও পিতামহের অভাব পূর্ণ করেছেন, এতীম ভ্রাতুষ্পুত্রকে পিতৃস্নেহে লালনপালন করেছেন, আবার নবী জীবনের সকল বিপদ-দুর্যোগ ও ঝড় ঝাপটার মুখে তাঁকে আগলে রেখেছেন। এমন দরদী অভিভাবকের চিরবিদায়ে নবী মুহাম্মদ যেন দুঃখের অকূল দরিয়ায় ডুবে গেলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, এ বছরটি ছিলো আমার জীবনে 'দুঃখের বছর'।

***

এদিকে যা আশংকা করা হয়েছিলো তাই ঘটলো। জালিম কোরেশ হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অভিভাবকহীন ও নিঃসঙ্গ ভেবে সরাসরি তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করলো এবং এক সময় তা এমন ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হলো যে, আল্লাহর রাসূলের পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিলো তারপরও হিম্মত ও মনোবল অটুট রাখা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে অবিচল থাকা। কিন্তু এক সময় তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে

অন্যত্র গমনের কথা ভাবতেই হলো। কেননা মক্কার ঊষর মরুতে ঈমান ও তওহীদের বীজ অংকুরিত হওয়ার আপাতত কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো না।

তাঁর মনে পড়লো শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত তায়েফের কথা। তিনি ভাবলেন, সবুজের সমারোহপূর্ণ ছায়াঘেরা তায়েফ হয়ত আমাকে নিরাশ করবে না। হয়ত কোন 'কর্ণ' তওহীদের বাণী শ্রবণ করবে এবং কোন হৃদয় ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করবে। শৈশবে যে তায়েফ আমাকে স্তন্য দান করেছে সেই তায়েফ আজ আমাকে আশ্রয় দেবে না, আমার কথা শোনবে না, তা হতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তায়েফ সফরের পরিকল্পনা টের পেয়ে কোরেশ এই বলে তায়েফীদের সতর্ক করে দিলো যে, পূর্বপুরুষদের ধর্ম যদি রক্ষা করতে চাও, সেই সাথে বিদ্যমান মৈত্রী সম্পর্ক যদি অটুট রাখতে চাও তাহলে মুহাম্মদকে আশ্রয় দানের চিন্তাও করো না।

দুর্ভাগা তায়েফ কোরেশের কথায় প্রভাবিত হলো। তাদের প্রতি নবীর সুধারণার কোন মর্যাদা তারা রক্ষা করলো না, বরং শহরের দুষ্কৃতিকারীদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিলো। তারা তাঁকে পাথর মেরে মেরে লহু লাহান করে ফেললো। ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত অবস্থায় শহর ত্যাগ করে তিনি শহরতলীর এক অঙ্গুর বাগানে আশ্রয় নিলেন। তাঁর শরীরের জখম থেকে ঝরছিলো লাল রক্ত, আর হৃদয়ের ক্ষত থেকে ঝরছিলো তপ্ত অশ্রু। হায়, রহমতের নবীর এ কী করুণ অবস্থা! এ কী বিপর্যস্ত দশা!! তবু দেখো, দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে তখন তিনি কী ফরিয়াদ করছেন–

'হে আল্লাহ! অসহায়ের সহায় তুমি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি। তোমারই সাহায্য প্রত্যাশী আমি। তোমারই করুণা ভিখারী এ অপরাধী। তোমাকে ছাড়া বলো আর কাকে জানাবো আমার ফরিয়াদ! কার হাতে আমাকে তুলে দিচ্ছো হে আল্লাহ! তাদের হাতে, অন্তরে যাদের দয়া-মায়া নেই, মুখে যাদের ভালোবাসার হাসি নেই!

তুমিই তো হলে আসমান যমীনের নূর। তোমার নূরেই তো সকল অন্ধকার হয় দূর। তোমার সেই নূরের আশ্রয় নিলাম আমি।'

আল্লাহর নবী আরো বললেন, 'তয়েফবাসীকে আমি কল্যাণের পথে ডেকেছি, মুক্তির পথ দেখিয়েছি, ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত দিয়েছি। আর তারা আমাকে পাথর মেরেছে, আমার রক্ত ঝরিয়েছে। তবু তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, অকল্যাণ কামনা নেই। তারা যদি আমার ডাক নাও শুনে তবু আমি আশা করি, তাদের সন্তান যারা হবে তারা একদিন শোনবে।'

হে আমেনার দুলাল! হে প্রিয়তম মুহাম্মদ! আপন-পর সকলকে এমন করে ভালোবাসতে পেরেছো তুমি, তাই তো স্রষ্টা তোমায় বলেছেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। হায়, পৃথিবীর মানবসম্প্রদায় যদি তোমার মানবপ্রেম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো!

***

তায়েফীদের এমন নিষ্ঠুর আচরণের পর প্রিয় নবী ভাবলেন, জন্মভূমি মক্কায় ফিরে যাওয়াই উত্তম। শত অত্যাচারের মাঝেও সেখানে তো সান্ত্বনা আছে আল্লাহর ঘর। মক্কা তো হলো প্রিয়তমের 'প্রেম-নগরী'। বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে আত্মা যে মহাপ্রশান্তি লাভ করে তা আর কোথায় পাবো!

খবর পেয়ে মক্কার মুশরিকরা নতুন জোট বেঁধে জোর তৎপরতা শুরু করলো, যাতে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন ভাবেই শহরে প্রবেশ করতে না পারেন।

হায়! নির্বোধেরা যদি বুঝতো, যার প্রতি আজ তাদের এ অনাদর, এ অবজ্ঞা তিনিই একদিন মহান বিজয়ীরূপে এ শহরে প্রবেশ করবেন এবং সবার সব অপরাধ হাসিমুখে ক্ষমা করে বুকে টেনে নেবেন!

ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিষণ্ন ও অবসন্ন অবস্থায় প্রিয় নবী মক্কার উপকণ্ঠে উপনীত হয়ে শহরের পরিস্থিতি এবং কোরেশের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হলেন এবং ব্যথিত অন্তরে নতুন করে ব্যথা পেলেন। এতো কিছুর পরও মুশরিকদের কাছ থেকে এতটা 'অমানবতা' তিনি আশা করেননি। কিন্তু বিপদ যত কঠিন হোক এবং পরিস্থিতি যত সঙ্গীন হোক আল্লাহর নবী কখনো বিচলিত হন না, ভেঙ্গে পড়েন না। কেননা তিনি তো 'ঐশী সত্তার'

নির্দেশে পরিচালিত হন। তদুপরি তিনি তো ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি সম্পর্কে অন্তর্দর্শী হন। এক্ষেত্রেও আল্লাহর নবী স্থির প্রশান্ত চিত্তে পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেন এবং হারামের প্রতিবেশী কোরেশের স্বভাব ঔদার্যের কথা স্মরণ করে এ আবেদন বার্তা পাঠালেন–

দেখো, আমি পরদেশী নই, তোমাদেরই একজন। আমারও জন্মভূমি, আমারও পিতৃভূমি এ মক্কা নগরী। হারামের প্রতিবেশীদের মাঝে এমন কোন 'মহানুভব' কি নেই যিনি আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন! নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি কারো অমঙ্গল করবো না। কারো শান্তি ভঙ্গ করবো না। শুধু আল্লাহর বাণী প্রচার করবো।

এমন মর্মস্পর্শী আবেদনেও কোরেশের মন নরম হলো না। কোন হৃদয়বান এসে তার হাত ধরে বললো না, আসুন মুহাম্মদ! আপনি এ শহরের সর্বোত্তম মানুষ। আপনারই অধিকার এখানে সবার আগে। আসুন আমার আশ্রয়ে, প্রাণ থাকতে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না আপনাকে।

ঊর্ধ্বলোকের নূরের সৃষ্টিরা যখন স্তব্ধ বিস্ময়ে মর্তলোকের মাটির মানুষের এ হৃদয়হীনতা অবলোকন করছিলো তখন মানুষ ও মানবতার মুখ রক্ষা করার জন্য একজন মানুষ অবশ্য এগিয়ে এসেছিলেন। পৃথিবীর সব দেশে, সব যুগে দু'একজন ভালো মানুষ অবশ্যই থাকেন। মানবতার লাজ তারাই রক্ষা করেন। জাহেলিয়াতের অন্ধকার আরবেও দু'একজন ভালো মানুষ ছিলেন। মুতইম হলেন তাদের একজন। যেমন উদার ও মহৎ, তেমনি সাহসী ও নির্ভীক। তিনি এগিয়ে এলেন এবং কাবাপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন–

'যে শহরে মুহাম্মদ আল-আমীনের স্থান নেই সেখানে কারো স্থান হতে পারে না। শোন মক্কাবাসী! আজ থেকে মুহাম্মদ আমার আশ্রিত। তোমরা তাঁকে কিছু বলবে না, তিনিও তোমাদের কিছু বলবেন না। মনে রেখো, অন্যায়ভাবে কেউ যদি তাঁকে বিরক্ত করো তাহলে তার সাথে আমার বোঝাপড়া হবে। আর ভুলে যেয়ো না যে, মুতইম ও তার পুত্ররা তরবারির ভাষা খুব ভালো বোঝে।'

বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন এই মুতইম। ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য তার হয়নি, সে জন্য আফসোস। কিন্তু 'নিরাশ্রয়' নবীকে আশ্রয় দেয়ার

যখন কেউ ছিলো না তখন তিনি তাঁর হাত ধরেছিলেন, তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, আসুন মুহাম্মদ! আমার আশ্রয়ে মক্কায় আসুন। দেখি কে আপনাকে কী বলে।

পরবর্তী জীবনে তাই প্রিয় নবী গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে মুতইমকে স্মরণ করেছেন।

'আশ্রয় দান' ছিলো আরবের অলঙ্ঘনীয় প্রথা। তাই কোরেশকে তা মেনে নিতে হয়েছিলো। কিন্তু মুশরিক সরদাররা এ কারণে মুতইমের উপর ক্রুদ্ধ হলো এবং বিভিন্ন ছল ছুতায় তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করলো, যাতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর হতে 'আশ্রয়' প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু কোরেশের প্রচণ্ড চাপ ও প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও মুতইম তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তাই সকল যুগের সকল মানুষের পক্ষ হতে তোমাকে হে মুতইম, অশেষ ধন্যবাদ।

কিন্তু সমগ্র বিশ্বে মহোত্তম চরিত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁর আবির্ভাব তিনি কীভাবে এটা বরদাশত করতে পারেন যে, একজন নিরপরাধ মানুষ দুর্ভোগ পোহাবে তাঁকে আশ্রয় দানের 'অপরাধে'। তাই একদিন কাবাপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন–

হে মক্কাবাসী! শোনো, আজ থেকে আমি মুতইমের আশ্রয় পরিত্যাগ করলাম। যে মহান সত্তা আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর আশ্রয়ই আমার জন্য যথেষ্ট। কেননা তাঁর হুকুম ছাড়া তোমরা কেউ আমার কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারো না।'

বস্তুতঃ প্রিয়নবীর এ ঘোষণায় আল্লাহর উপর ঈমান ও তাওয়াক্কুলের এমন তাজাল্লি প্রকাশ পেলো যে, সামান্য বিবেক-বুদ্ধি যাদের ছিলো তারা ভাবতে বাধ্য হলো যে, কোথায় মুহাম্মদের এ মহাশক্তির উৎস ? তবে কি সত্যি তিনি আল্লাহর বলে বলীয়ান ? তাঁর বিজয়ের দিন কি তবে সমাগত?

***

মুতইমের আশ্রয় পরিত্যাগের ঘটনার কিছুদিন পরই আরবের প্রভাবশালী সরদার ও গোত্র-প্রধান তোফায়েল মক্কায় আগমন করলেন। কোরেশ তাকে বেশ খাতির-যত্ন করে এ মর্মে সতর্ক করে দিলো যে,

নবুয়তের দাবীদার মুহাম্মদ এক পাগল। কথার জাদুতে ভুলিয়ে মানুষকে তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করছেন। সুতরাং তাঁর সংস্পর্শ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা কর্তব্য।

কিন্তু এর ফল হলো উল্টো। তোফায়েল হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মপ্রচার সম্পর্কে কৌতুহলী হলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন তিনি নামাযরত অবস্থায় প্রিয় নবীর কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করলেন। আর তখনি তার মহাসৌভাগ্যের আসমানী ফায়সালা নেমে এলো। এক অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবতন্ময়তায় তিনি ডুবে গেলেন। পরম সত্যের উষ্ণ পরশে হৃদয় যেন তার দ্রবীভূত হয়ে চলেছে, আর সে গলিত ধারা দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে! তার সত্যসন্ধানী আত্মা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো, এ তো মানুষের কালাম নয়, এ তো অন্য কিছু! এ তো আমার তৃষ্ণার্ত আত্মার শীতল পানীয়!

প্রিয় নবী যখন নামায থেকে ফারেগ হলেন তোফায়েল তখন আদবের সাথে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের অপূর্ব সুর। তিনি বললেন–

'মুহাম্মদ! লোকে বলে আপনি জাদুকর। যার কানে একবার আপনার কথা পড়ে সে আপনার বশীভূত হয়ে পড়ে। জানি না তাদের কথা কতদূর সত্য। তবে এ কথা সত্য যে, আপনার কালাম আমার হৃদয়ে অদ্ভুত এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পরম সত্যের আলোকোদ্ভাস যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার মন বলছে, আপনার দাবী অসত্য হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এ কালাম আপনার নয়, কোন মানুষের নয়। নিঃসন্দেহে এ আল্লাহর কালাম। হে মুহাম্মদ! অনুগ্রহ করুন, আমাকে ইসলামের আলো দান করুন।'

আশ্চর্য! আরবের এক অভিজাত গোত্র-প্রধান, স্বগোত্রের প্রতিটি যোদ্ধার তরবারি যার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুহূর্তে কোষমুক্ত হয়, হারামের প্রতিবেশী কোরেশ পর্যন্ত যাকে খাতির করে, ইজ্জতের নজরে দেখে, তিনি আজ ভিক্ষা-পাত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন মুহাম্মদের দরজায়– আপন গোত্রে যার কোন সমাদর নেই, মক্কার বুকে যিনি নিঃসঙ্গ অসহায় এক মানুষ। কিন্তু কিসের টানে! কিসের আকর্ষণে! কোন মহাসম্পদ প্রাপ্তির

আশায়! কোথায় এর রহস্য!

শোনো বন্ধু আমার! এ হলো প্রেমের লীলাখেলা। এ হলো পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সখ্যতা। দেহসত্তার স্থূলতায় এ রহস্যের সন্ধান পাবে না তুমি। প্রেম-পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, পরমাত্মার সঙ্গে যখন মানবাত্মার মিলন হয়, তখন এমনই হয় বন্ধু! এমনই হয়। বাদশাহ তখন ফকীর বেশে প্রশান্তি লাভ করেন। রাণী তখন দাসী সেজে ধন্য ভাবেন। আল্লাহর নবীর কণ্ঠে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করে সে প্রেমেরই সন্ধান পেয়েছিলেন আরবের অভিজাত গোত্র-প্রধান তোফায়েল।

তোফায়েলের ন্যায় প্রভাবশালী সরদারের ইসলাম গ্রহণ ছিলো এমন এক প্রচণ্ড আঘাত যা নীরবে হজম করা কোরেশের পক্ষে ছিলো অসম্ভব। তাই সরদার তোফায়েল তো ইসলামের আলো বহন করে স্ব গোত্রে ফিরে গেলেন, কিন্তু মক্কায় ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন নতুন করে জ্বলে উঠলো। ক্ষিপ্ত কোরেশ নতুন আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর রাসূলের উপর। এ পর্যায়ে নির্যাতন-নিপীড়নের যে ভয়াবহতা তাঁর উপর নেমে এসেছিলো সে কথা স্মরণ করেই হয়ত পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর পথে যে কষ্ট আমাকে দেয়া হয়েছে তা আর কাউকে দেয়া হয়নি'।

তৃতীয় অধ্যায়

এভাবে জালিমদের জুলুম-অত্যাচার যখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেলো প্রিয় নবী তখন ছাহাবা কেরামকে দ্বিতীয়বার হিজরতের উপদেশ দিলেন। তবে এবার হিজরতভূমি হলো হেজাযের প্রসিদ্ধ শহর ইয়াছরিব, যা পরবর্তী কালে মাদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর নামে ধন্য হয়েছে। সেখানে বসবাসকারী আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে ইতিমধ্যে ইসলামের আলো প্রবশে করেছিলো। এমন কি মদীনার নও মুসলিমগণ প্রিয় নবীর পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণপূর্বক তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরত করার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় তারা এ প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন যে, জান্নাত লাভের বিনিময়ে ইয়াছরিবের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে আমরা আপনার হিফাজত করতে প্রস্তুত।

এ সকল কারণে এবার হাবশার তুলনায় মদীনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হলো। মজলুম মুসলমানগণ তখন একজন দু'জন করে অতি সঙ্গোপনে মক্কা ত্যাগ করতে শুরু করলেন। এভাবে প্রায় সকল মুসলমান মুশরিকদের অজ্ঞাতসারে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। শুধু হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আবু বকর ও হযরত আলী পরিবার-পরিজনসহ মক্কায় রয়ে গেলেন। অবশ্য কতিপয় মাজুর মুসলমানও ছিলেন যাদের পক্ষে হিজরতের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো না।

অনেক পরে পরিস্থিতি টের পেয়ে কোরেশ দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লো। মুহাম্মদের অনুসারীরা প্রায় সকলে মক্কা ত্যাগ করে নিরাপদে ইয়াছরিব চলে গেছে। এখন মুহাম্মদও যদি ইয়াছরিবে পাড়ি জমাতে পারেন তাহলে কোরেশ ও মক্কার ভবিষ্যত অন্ধকার। কেননা খুব সহজেই ইসলাম তখন আরব গোত্রগুলোতে প্রসার লাভ করবে এবং মুহাম্মদ অপরাজেয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। তখন তাঁর হাতে কোরেশদের পরাজয় ও মক্কার পতন হবে অনিবার্য। এমন কি সমগ্র আরবে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ফলে কোরেশের কোন আশ্রয়স্থল

থাকবে না আরব ভূখণ্ডে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই মুহাম্মদকে হাতছাড়া করা চলবে না। যে কোন মূল্যে খতম করতে হবে তাঁকে।

দারুন্-নাদওয়ার জরুরী পরামর্শসভায় বিস্তর বাকবিতণ্ডা ও শোরগোলের পরও যখন কোন কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছিলো না তখন মূর্খের সেরা আবু জেহেল প্রস্তাব করলো–

এককভাবে কোন গোত্রের পক্ষে মুহাম্মদকে হত্যার ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। কেননা বনু হাশিম ঐ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং মুহাম্মদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষান্ত হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো, কোরেশের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সাহসী যুবক নির্বাচন করো। তারা একযোগে মুহাম্মদের উপর তলোয়ার চালাবে। এভাবে মুহাম্মদের রক্তের দায় কোরেশের সকল শাখার উপর বর্তাবে। আর একা বনু হাশিমের পক্ষে সম্মিলিত কোরেশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। এভাবে পথের কাঁটাও দূর হবে, আবার একটি অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধের হাত থেকেও আমরা রক্ষা পাবো।

বদমাশটার দুর্বুদ্ধির সত্যি তারিফ করতে হয়। হায়রে মূর্খ! একবার যদি ভেবে দেখতে, জগতে কত আবু জেহেল এসেছে আবার গায়েব হয়েছে, কে তাদের খোঁজ রাখে, কে তাদের নাম জানে? কিন্তু তুমি আবু জেহেল জগতজোড়া পরিচয় লাভ করেছো আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে শত্রু সম্পর্কেরই সুবাদে। তা না হলে তোমার নাপাক নাম কি লেখা হতো আমাদের কলমের কালিতে! সুতরাং তুমিও হাবীবে খোদার নিকট চিরঋণে ঋণী। এই ঋণটুকু যদি স্মরণ রাখতে তাহলে আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার দুর্বুদ্ধি অন্তত মাথায় আসতো না।

যাই হোক, কোরেশ সরদারগণ আবু জেহেলের প্রস্তাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করলো। তারা একবাক্যে স্বীকার করলো যে, এর চেয়ে উত্তম কোন প্রস্তাব হতে পারে না। এভাবে একদল নরপশুর গোপন বৈঠকে মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত হলো। বিশ্বমানবের রহমতরূপে যাঁর শুভাগমন; তোমার, আমার– আমাদের সকলের হিদায়াত ও মুক্তির জন্য নিবেদিত যাঁর পবিত্র জীবন– তাঁকে, সেই দরদী বন্ধুকে তারা হত্যা

করবে রাতের অন্ধকারে। হায়, এর পূর্বে কেন তাদের মরণ হলো না! কেন তাদের চক্ষু অন্ধ হলো না কিংবা কেন তাদের অন্তর্চক্ষু উন্মীলিত হলো না! তাহলে তো মানবজাতির ইতিহাস এ জঘন্যতম কলংক থেকে পবিত্র হতো।

***

কিন্তু আল্লাহ তো আছেন! তিনি তো সব কিছু জানেন! জগতসংসারের কোন কিছু তো তাঁর অজানা নয়। তাই আল্লাহর হাবীবেরও অগোচর থাকলো না নরপশুদের এ ঘৃণ্য চক্রান্ত।

আবু জেহেলের নেতৃত্বে ঘাতকদল রাতের অন্ধকারে নবী-গৃহের চারপাশে নিঃশব্দ অবস্থান গ্রহণ করলো। কিন্তু আল্লাহর নবী পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিলেন। হযরত আলীকে তিনি বললেন–

‘তুমি আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকো, যাতে ওরা আমার অনুপস্থিতি টের না পায়। যাদের আমানত আমার নিকট গচ্ছিত রয়েছে সেগুলো স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছে দিয়ে তবে তুমি রওয়ানা হবে। ইনশাআল্লাহ ওরা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।’

জগতে আর কোথাও কখনো কি ঘটেছে এমন আশ্চর্য ঘটনা! শত্রুর নিকট সম্পদ গচ্ছিত রাখা! তদুপরি জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে গচ্ছিত সম্পদ প্রত্যার্পণের এমন আশ্চর্য প্রয়াস! আহা, এমন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নির্বোধেরা যদি বন্ধুরূপে বরণ করে নিতো!

আল্লাহর নবী কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে এবং কাফিরদের চোখে ধূলো নিক্ষেপ করে গৃহ ত্যাগ করলেন। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি এমনই নিষ্ক্রিয় হলো যে, কিছুই টের পেলো না তারা কেউ। কিছুক্ষণ পরপর তারা ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখতে পেলো, ‘মুহাম্মদ’ চাদর মুড়ি দিয়ে শয্যায় শায়িত রয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর ছাহাবাদের প্রেম ও ভালবাসার এবং আত্মত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের এই ছিলো নমুনা। এমন অপূর্ব দৃশ্য আসমান-যমীন এই একবার মাত্র দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলো। প্রিয়তমের জন্য এমন নিশ্চিন্ত মনে, এমন

প্রশান্তির সাথে যিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করতে পারেন– তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার গভীরতা কি তুমি কল্পনা করতে পারো! ধন্য মুহাম্মদ, ধন্য মুহাম্মদের ছাহাবা, আর ধন্য আমাদের মানব জীবন। কেননা মানব হিসাবে আমাদেরই গর্ব তাঁরা।

পূর্ব আকাশে ভোরের আলো দেখা দেয়ার সময় হয়ে এলো, অথচ মুহাম্মদ এখনো শয্যা ত্যাগ করছেন না! এমন তো কখনো হয় না! ঘাতকদের মনে হয়ত কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছিলো। আর বিলম্ব না করে তারা ঘরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ঘুমন্ত মানুষটির মুখ থেকে চাদর সরিয়েই ঘাতকদল হতবাক! কয়েক মুহূর্ত তাদের কেটে গেলো স্তব্ধ অবস্থায়। কোরেশের চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে! মুহাম্মদ তাদের শিকারী চোখকে ফাঁকি দিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছেন, বুঝতে পেরে দিশেহারা ও উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় তারা ছুটে গেলো হযরত আবু বকরের বাড়ী। কিন্তু সেখানেও শূন্য গৃহ। আবু জেহেল তখন ক্রোধে এমনই আত্মহারা যে, আবু বকর-কন্যা আসমার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে বসলো। অথচ কোন সাধারণ আরবও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলার কথা কল্পনা করতে পারে না। আসমা শান্তভাবে শুধু বললেন, অবশেষে তোমার আরবরক্তেও পচন ধরেছে আবু জেহেল!

মক্কার সম্ভাব্য সবখানে এবং সব ঘরে তল্লাশী হলো। হায়েনার দল হন্যে হয়ে খুঁজলো, কিন্তু কোথায় মুহাম্মদ!

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন মক্কা থেকে আড়াই মাইল দূরে ছওর পর্বতের গুহায় প্রিয় ছাহাবী আবু বকরের কোলে মাথা রেখে প্রশান্তির ঘুম ঘুমিয়ে আছেন।

শয়তানের বিভৎস চেহারায় কালি মেখে দিলে কেমন হবে দেখতে! আবু জেহেলের চেহারা তখন প্রায় সে রকম হলো। এর আগে সে মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো। তাই অর্থলোভী যুবকের দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এমন কি সন্ধানকারীদের একটি দল তো পায়ের ছাপ অনুসরণ করে করে ছওর পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। হযরত আবু বকর গুহার ভিতর থেকে তাদের পা পর্যন্ত দেখতে পেলেন এবং প্রিয়তম নবীর নিরাপত্তার চিন্তায় বিচলিত হলেন। কিন্তু

আল্লাহর রাসূল সম্পূর্ণ প্রশান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন–

'চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'

অতি সত্য কথা। এখানেও আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পেলো। গুহামুখে মাকড়সার জাল এবং ডিমপাড়া কবুতরের বাসা দেখে অনুসন্ধানকারী দল বোকা বনে ফিরে গেলো। কারো কল্পনায়ও এলো না যে, এখানে গুহার ভিতরে সেই মানুষটি পরম নিশ্চিন্তে বসে আছেন যাঁর জন্য গোটা মক্কাভূমি চষে ফেলছে কোরেশদল।

যদি জিজ্ঞাসা করো, গুহামুখে মাকড়সা কেন জাল বিস্তার করলো? কবুতরই বা বাসা বানিয়ে কেন ডিম দিতে গেলো? তাহলে বলবো, অধিক বুঝতে যেয়ো না বন্ধু! শুধু বুঝে নাও, এটা আল্লাহর কুদরত।

এখানে ছওর পর্বতের গুহায় অবস্থানকালেও ছাহাবা কেরামের নবী প্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ প্রকাশ পেয়েছিলো। গুহার একটি ছিদ্রপথে হযরত আবু বকর পায়ের আঙ্গুল ঢুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে বিষাক্ত কোন সরিসৃপ প্রবেশ করতে না পারে। প্রিয় নবী যখন তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন একটি বিষধর সাপ তার আঙ্গুলে দংশন করে বসলো। দংশনযন্ত্রণায় তিনি অস্থির হলেন এবং বিষের প্রভাবে তার শরীর নিস্তেজ হলো, কিন্তু তিনি পা সরালেন না, বরং প্রাণপণ চেষ্টায় নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেন, যাতে প্রিয়তমের নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটে। প্রিয় নবী জাগ্রত হয়ে অবস্থা অবগত হলেন এবং বললেন, আমাকে জাগালে না কেন?

হযরত আবু বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে, এর চেয়ে যে আমার মৃত্যু ভালো।

আল্লাহর রাসূল প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রিয় সঙ্গীর পানে তাকালেন। এমন উত্তরই তিনি আশা করেছিলেন। তখন তিনি 'দংশন-স্থানে' মুখের পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। থুথু তো নয়, অমৃতজল। সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া সেরে গেলো এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

তিন দিন আত্মগোপনের পর আল্লাহর নবী গুহা ত্যাগ করে মদীনার

পথে সফর শুরু করলেন। এ দীর্ঘ সফরের পদে পদে ছিলো বিপদের আশংকা। কিন্তু আল্লাহর রহমতে নিরাপদেই তিনি মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত আলীও যথাসময়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন।

মদীনার মুসলিমগণ তাদের প্রাণপ্রিয় নবীর শুভাগমনের সংবাদ আগেই জেনেছিলেন। তাই প্রতিদিন তারা প্রতীক্ষার প্রহর গুণছিলেন। এখন যেন তারা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। অনির্বচনীয় আনন্দের এক অপূর্ব হিল্লোল বয়ে গেলো সকলের মনে। নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর সকলে আনন্দের তরঙ্গে দোল খেয়ে সমকণ্ঠে গেয়ে উঠলো অপূর্ব এক স্বাগতম সঙ্গীত–

'ওয়াদা পর্বতের পথ-রেখা ধরে আমাদের মাঝে আজ উদিত হলেন পূর্ণিমার নূরানী চাঁদ / আল্লাহর পথে আহ্বানধ্বনি যতদিন হবে উচ্চারিত ততদিন আমাদের এ কৃতজ্ঞতা নিবেদন / আমাদের মাঝে প্রেরিত হে নবী! আপনার জন্য পূর্ণ আনুগত্যের স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার।'

যুগে যুগে পৃথিবীর কত দেশ কত জাতি তাদের পূজনীয়কে 'স্বাগতম' নিবেদন করেছে! কত গান, কত সঙ্গীত তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছে! কিন্তু মদীনার মুসলিম কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিষ্পাপ হৃদয়ের ভক্তি-ভালোবাসার স্বর্গীয় সুরভি মেখে যে স্বাগতমসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলো তার তুলনা কোথায় খুঁজে পাবে তুমি!

বন্ধু, কল্পনার চোখে একবার অবলোকন করো মদীনার শিশু-কিশোরদের 'নবী-বরণ' উৎসবের সে অপূর্ব দৃশ্য। দেখো, তোমার চিত্ত কিরূপ আনন্দে হিল্লোলিত হয়! মুগ্ধ ও অভিভূত হয়!

দেখো মক্কা, দেখো! তোমার অনাদৃত সম্পদ কত সাদরে, কত সমাদরে বরিত হলো ইয়াছরিবে। ধন্য ইয়াছরিব! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার প্রতিটি বালুকণা!

এরপর যে দৃশ্যের অবতারণা হলো তা আরো অপূর্ব। আরো মনোমুগ্ধকর। আশ্চর্য মধুর এক প্রতিযোগিতা সকলের মাঝে। একই আকুতি, একই মিনতি সকলের কণ্ঠে–

'আমার ঘর আলো করুন হে নবী! আমাকে ধন্য করুন হে রাসূল!'

কেউ জানে না কোন গৃহে মেহামন হবেন আল্লাহর হাবীব। কার ললাটে শোভা পাবে মহাসৌভাগ্যের এ 'আলোক তিলক'। তাই সকল মুখে আশা-নিরাশার ছায়া, সকল হৃদয়ে উৎকণ্ঠার জোয়ার-ভাটা। কিন্তু আল্লাহর নবী কি পারেন কাউকে নিরাশ করতে! কারো মনের আশা অপূর্ণ রাখতে! ইয়াছরিবের প্রাণঢালা সম্বর্ধনায় এবং হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি-ভালোবাসায় আল্লাহর হাবীব প্রীত হলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং সকলকে খুশী করে বললেন, আমি তোমাদের সকলের মেহমান, তবে জানি না কোন গৃহে হবে আমার অবস্থান। তোমরা আমার উটনীকে পথ করে দাও। কেননা সে 'আদিষ্ট'।

'সকলের মেহামান' পবিত্র মুখের এই একটি মাত্র উচ্চারণ সকলকে যেন সৌভাগ্যের নূর-তাজাল্লিতে সমান ভাবে স্নাত করলো। সকলেই কৃতার্থ হলো এবং উটনীকে পথ করে দিলো। আর ধীর শান্ত পদক্ষেপে অনেক বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করে উটনী গিয়ে বসলো আবু আইয়ূব আনছারীর গৃহ-অঙ্গনে।

'মারহাবা আবু আইয়ূব' বলে সকলে আন্তরিক মুবারকবাদ জানালো এই 'খোশনসীবকে'। এ আনন্দ যেন সকলের! এ সৌভাগ্য যেন মদীনার প্রতিটি মানুষের! আর আবু আইয়ূব! আনন্দোচ্ছ্বাস তাঁর হৃদয়াকাশে রংধনুর যে অপরূপ রূপ ধারণ করেছিলো তা কীভাবে বোঝবো আমি! কীভাবেই বা বোঝাবো তোমাকে!

তবে সৌভাগ্যের সূত্রটুকু বলি শোনো! বহু শতাব্দী পূর্বে আবু আইয়ূবের এক পূর্বপুরুষ 'জ্ঞানপ্রাপ্ত' হলেন যে, হেজাযের ইয়াছরিব শহরে শেষ নবীর শুভাগমন হবে। তখন তিনি প্রতিশ্রুত নবীর দীদার সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ইয়াছরিবে হিজরত করলেন। তখন থেকে এ মহান পরিবার বংশ পরম্পরায় আখেরী নবীর দীদার সৌভাগ্য লাভের ইন্‌তিজারে ছিলো। মৃত্যু শয্যায় পরবর্তী বংশধরের নিকট প্রত্যেক পূর্বপুরুষের এই ওছিয়ত ছিলো–

'আখেরী নবীর দীদার যদি লাভ করো, তাঁকে আমার সালাম পেশ করো এবং আরয করো, আমি অধম তাঁর ইনতিজার করেছিলাম। দীদার সৌভাগ্য থেকে তো বঞ্চিত হলাম, কিন্তু তাঁর দয়া ও দু'আ থেকে যেন

মাহরূম না হই।'

আবু আউয়ূব ছিলেন এই পরিবারের শেষ পুরুষ।

বলো বন্ধু, আবু আইয়ূব ছাড়া এ মহাসৌভাগ্য আর হতে পারে কার!

মদীনায় শুভাগমনের পর হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণের কাজে মনোযোগী হলেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি মানবজাতির সামনে মহোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মসজিদের জন্য নির্বাচিত স্থানটি ছিলো দু'টি এতীম বালকের মালি্কানাধীন। মসজিদের জন্য তারা সাগ্রহে জমি দান করতে প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু আল্লাহর নবী মূল্য পরিশোধপূর্বক তা খরিদ করে নিলেন। পরে মসজিদ নির্মাণকালে ছাহাবা কেরামের সঙ্গে তিনিও সাধারণ শ্রমিকের মত কাজ করেছেন এবং পাথর বহন করেছেন।

মসজিদুন্নবী তৈরী হওয়ার পর মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর রাসূল মসজিদ থেকেই পরিচালনা করতেন। তখন থেকে মসজিদই হলো মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াফাতের পরও বহু যুগ পর্যন্ত মসজিদ মুসলিম সমাজের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় বহাল ছিলো। কিন্তু মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া মসজিদের সাথে মুসলিম সমাজের আর কোন সম্পর্ক এখন নেই। সম্ভবত এটাই মুসলিম সমাজের বর্তমান অধঃপতনের অন্যতম কারণ। অবশ্য মুসলিম 'ধর্মপণ্ডিৎগণই' এ বিষয়ে ভালো বলতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, মদীনায় বসবাসরত সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মাঝে সাধারণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। সকলের মাঝে তিনি এই সাধারণ চেতনা জাগ্রত করলেন যে, ইহুদী, মুশরিক ও (আনসার মুহাজির) মুসলিম সকলেই মদীনার নাগরিক। মদীনার শান্তি ও নিরপত্তার জন্য সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সম্প্রীতি অপরিহার্য। আর এ জন্য পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো প্রধান শর্ত।

বলাবাহুল্য যে, প্রিয় নবীর আহ্বানে মদীনার সকল সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিলো এবং তাঁর নিরংকুশ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলো।

***

মদীনায় হিজরতের পর ইসলাম ও কুফুরের মাঝে বেশ কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যে সব যুদ্ধ আল্লাহর নবী স্বয়ং পরিচালনা করেছেন ইসলামের পরিভাষায় সেগুলো হচ্ছে গাযওয়া। পক্ষান্তরে যে সকল বাহিনী কোন ছাহাবীর নেতৃত্বে বা সেনাপতিত্বে প্রেরিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে সারিয়্যা। গাযওয়াতুল বদর ছিলো মক্কার কোরেশের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের প্রথম যুদ্ধ। তাতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছিলেন। আর মক্কাবিজয় তো ছিলো সমগ্র আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা। এমন কি সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসেও মক্কাবিজয়ের প্রভাব ছিলো সুগভীর।

নীতিগতভাবে ইসলাম যুদ্ধের পক্ষে নয়। তদুপরি লোকবল ও অস্ত্রবল কোন দিক থেকেই মুসলমানদের তখন আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অবস্থান ছিলো না। সুতরাং আল্লাহর রাসূলের নামে রাজ্যদখলের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের অপবাদ আরোপ করা অতি হাস্যকর। নিরস্ত্র ও অসহায় একটি ক্ষুদ্র দলের ভরসায় সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো আত্মঘাতী পদক্ষেপ হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্ত্রধারণ করা তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার অধিকার একটি স্বীকৃত মানবিক অধিকার। পৃথিবীর সব জুলুম-অত্যাচারেরই একটা সীমা রয়েছে। সেই সীমা অতিক্রম করার পরও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকা মানবতা ও ভদ্রতা নয়; বরং ভীরুতা ও কাপুরুষতা। আগুনের তাপে শীতল পানি নিজেই শুধু উত্তপ্ত হয় না, বরং আগুনের স্বভাব গ্রহণ করে অন্যকেও ঝলসে দেয়। মুসলমানদের অবস্থাও ছিলো সেই শীতল পানির ন্যায়। ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে' যে ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতন মক্কার মুশরিকদের হাতে তারা ভোগ করেছেন তার নযীর পৃথিবীর অন্য কোন জাতির, অন্য কোন ধর্মের ইতিহাসে নেই। তদ্রূপ

কোরেশের বর্বরতা ও পাশবিকতার মুখে যে অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও কোরবানীর পরিচয় তারা দিয়েছেন তাও ছিলো অতুলনীয়। কিন্তু বর্বরতা ও পাশবিকতা যখন সকল সীমা অতিক্রম করে গেলো, অন্যদিকে আত্মরক্ষার নূন্যতম শক্তি মুসলমানদের অর্জিত হলো তখন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিলো। তবু ইতিহাস সাক্ষী, নবীজী ও তাঁর ছাহাবীদের সামরিক কার্যকলাপ ছিলো আগাগোড়া আত্মরক্ষামূলক। জাতি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

***

হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মদীনার নেতৃত্বের মর্যাদায় বরণ করে মদীনাবাসীগণ যে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছিলো তা ছিলো তাঁর যথার্থ প্রাপ্য।

কিন্তু পৃথিবীতে মানব জাতির জীবনযাত্রা যে দিন থেকে শুরু, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অস্তিত্বও তখন থেকে বিদ্যমান। পৃথিবীর সকল যুগে, সকল দেশে হিংসুক ও বিদ্বেষপ্রবণ লোকদের অস্তিত্ব ছিলো। মদীনার সমাজ এর ব্যতিক্রম ছিলো না। হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলো মদীনার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। এমন কি মদীনার একচ্ছত্র শাসকরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মুকুট ধারণের আয়োজনও শুরু হয়েছিলো। উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ নিজেও ছিলো ক্ষমতার স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদীনায় শুভাগমনের পর সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেলো। তিনি হয়ে গেলেন মদীনাবাসীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার একক কেন্দ্র। এমন কি এতোদিন যারা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ভক্ত-অনুরক্ত ছিলো তাদেরও বিরাট একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করে প্রাণোৎসর্গী আনসারদের কাতারে শামিল হয়ে গেলো। মোটকথা, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জনপ্রিয়তায় ভীষণ ভাটা পড়লো এবং তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। ফলে তার মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে।

মক্কার কোরেশদের শত্রুতা তো ছিলোই। এখন 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এই নীতিতে বিশ্বাসী সুচতুর আব্দুল্লাহ বিন উবাই মক্কার সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করলো। সলাপরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হলো যে, কোরেশ মদীনা আক্রমণ করলে উবাইয়ের পুত্র তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের গতিবিধি মুসলমানদের নজরে অবশ্যই ছিলো। সংকটকালে ঘরের এ শত্রু যে ছোবল হানতে উদ্যত হবে সে বিষয়ে মুসলমানদের মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, মক্কার কোরেশ প্রথম সুযোগেই মদীনা আক্রমণ করবে, আর তখন একটি মুসিলম শিশুও রক্ষা পাবে না রক্ত পিপাসু কোরেশের তলোয়ার থেকে।

***

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেলো। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোরেশের একটি কাফেলা সিরিয়া থেকে খাদ্য ও অস্ত্র সম্ভার নিয়ে মক্কায় ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী উপকূলীয় এলাকা অতিক্রম করছিলো। আবু সুফিয়ান মুসলমানদের পক্ষ হতে হামলার আশংকায় বিচলিত ছিলেন। কেননা এ বিপুল অস্ত্র সম্ভার শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেলে কোরেশের ভাগ্যবিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়বে এবং এর দায়ভাগ তাকেই বহন করতে হবে। তাই আবু সুফিয়ান জরুরী সাহায্যের বার্তাসহ এক দ্রুতগামী সাওয়ার মক্কায় পাঠালেন।

সওয়ার উটের কান দু'টো কেটে, হাওদা উল্টোমুখো করে এবং নিজের পোশাকে রক্ত মেখে এক অভিনব সাজে মক্কায় প্রবেশ করলো। ফলে 'কান-কাটা' সওয়ারের আগমন সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। কৌতুহলী মানুষের ভিড় জমে গেলো, আর সে জনতার উদ্দেশ্যে 'অনল বর্ষণ' করলো এভাবে–

'হে মক্কাবাসী! তোমাদের কাফেলা মুহাম্মদের হামলার মুখে রয়েছে। নিজেদের সম্পদ ও অস্ত্র সম্ভার যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে এই মুহূর্তে ছুটে চলো মদীনায়।'

আবু জেহেল যেন জীবনের সুযোগ পেয়ে গেলো। ফলে কোরেশকে সে যুদ্ধের উন্মাদনায় এমনই মাতিয়ে তুললো যে, এক হাজার যোদ্ধার সুসজ্জিত বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে গেলো। দু'একজন বিচক্ষণ সরদার অবশ্য ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলো। কিন্তু এক হাজার তলোয়ার তখন রক্তের পিপাসায় ঝলসে উঠেছে। তাই কারো পরামর্শের তোয়াক্কা না করে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কোরেশবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করলো।

এদিকে আবু সুফিয়ান ঘুর পথে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে গেলেন এবং আবু জেহেলকে ফিরে আসার বার্তা দিয়ে দ্রুতগামী সওয়ার পাঠালেন। কিন্ত নাম যার আবু জেহেল (মূর্খের সেরা) সে কেন শোনবে বুদ্ধির পরামর্শ! তাছাড়া বদরের তপ্ত বালু যে তার গলিজ খুনে পিয়াস বুজাতে উন্মুখ ছিলো! মুসলিমবাহিনীর নাঙ্গা তলোয়ারের অগ্রভাগে যে লেখা ছিলো তার মওতের তকদীর! সুতরাং বদরের বালুভূমিতে গিয়ে হাজির হলো সে নিয়তির টানে। কোরেশবাহিনীর এক হাজার যোদ্ধার মোকাবেলায় (আনসার-মুহাজির মিলে) মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো মাত্র তিনশ তের। তাও প্রায় নিরস্ত্র ও রসদবঞ্চিত। এমন কি তরবারিও ছিলো না সবার কাছে। তবে শাহাদাতের অনন্ত পিপাসা ছিলো তাঁদের বুকে এবং প্রিয় নবীর ইশারায় জান কোরবান করার সুমধুর প্রতিযোগিতা ছিলো তাঁদের মাঝে। হয় শহীদ, নয় গাযী– এই ছিলো তাঁদের নীতি। তাই প্রতিপক্ষের লোকবল ও অস্ত্রবল দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হলো না তাঁরা।

আল্লাহর গায়েবী মদদও ছিলো মুসলমানদের পক্ষে। যুদ্ধকালে স্বচ্ছন্দ গতিবিধির সুযোগ হবে ভেবে কোরেশবাহিনী বদর প্রান্তরের কঠিন ভূমির অংশ দখলে নিয়ে নিলো। ফলে মুসলিমবাহিনী নরম বালুর অংশে অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হলো। কিন্তু হঠাৎ এক বৃষ্টিতে উভয় পক্ষের অবস্থানগত সুবিধা পাল্টে গেলো। বালু বসে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের চলাফেরা সহজ হলো। পক্ষান্তরে মুশরিকদের অংশ কাদাপূর্ণ হয়ে গেলো। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতায় যুদ্ধের পূর্বেই কোরেশযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো।

প্রথমে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হলো। মুসলিমপক্ষের হামযা, আলী ও আবু ওবায়দা

কোরেশের ওৎবা, ওয়ালীদ ও শায়বার মুখোমুখি হলেন। ওদের তিনজনই নিহত হলো। অন্যদিকে শুধু আবু ওবায়দা শহীদ হলেন। এরপর শুরু হলো সর্বাত্মক যুদ্ধ এবং ক্রমশ তা ঘোরতর রূপ ধারণ করতে লাগলো। অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার মোকাবেলায় প্রায় নিরস্ত্র তিনশ তেরজন মুজাহিদের অবস্থা ছিলো বড় সঙ্গীন। হাজার নেকড়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র মেষপালের উপর, কিংবা কোন প্রবল ঝড় নিভিয়ে দিতে চাইছে ছোট্ট একটি প্রদীপ। আল্লাহর নবী তখন সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন আসমানী মদদের আশায়। হৃদয়ের সবটুকু দরদ ও আকুতি ঢেলে দিয়ে ফরিয়াদ জানালেন পরম প্রিয়তমের কাছে এভাবে–

'হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের এ ক্ষুদ্র দল যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে যে তোমার ইবাদত হবে না আর!

ফরিয়াদ পৌঁছে গেলো সাত আসমানের উপরে আরশের মোকামে। সেখানে ফায়সালা হয়ে গেলো হক-বাতিলের জয়-পরাজয়ের। আসমানী মদদরূপে ফেরেশতাদল নেমে এলো তিন হাজারে এবং পাঁচ হাজারে। আল্লাহর হাবীব তখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং ছাহাবা কেরামকে সুসংবাদ জানালেন। ফলে তাঁদের মাঝে দেখা দিল নতুন জোর ও উদ্যম এবং নতুন হিম্মত ও উদ্দীপনা। দেখতে দেখতে ময়দান চলে এলো মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। হাজার যোদ্ধার শক্তিমদমত্ত কোরেশ-বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হলো। নিহত হলো সত্তর জন, আহত ও বন্দী হলো আরো সমসংখ্যক। পক্ষান্তরে মাত্র চৌদ্দজন আনসার ও মুহাজির শহীদ হলেন।

মুসলিম-হৃদয়ে নবীপ্রেম ছিলো কেমন সুগভীর তার দু'একটি নমুনা এখানে দেখুন।

যুবক পুত্রের শাহাদাতের খবর শুনে বৃদ্ধা মা আল্লাহর রাসূলের খিদমতে হাজির হয়ে পরম প্রশান্তির সাথে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি বলে দেন যে, আমার পুত্র জান্নাতি হয়েছে তাহলে আমার কোন দুঃখ নেই।

সুবহানাল্লাহ! সাদামাঠা ক'টি কথা, কিন্তু ঈমান ও বিশ্বাসের এবং ভক্তি ও ভালোবাসার কী সুগভীর অভিব্যক্তি!

দুই আনসার কিশোর সহোদর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আবু জেহেলকে

একবার নাগালে পেলেই হয়, তরবারির এক আঘাতে দু'টুকরো করে তবে মনের জ্বালা মেটাবেন। কেননা তারা শুনেছেন, এই নরাধম মক্কায় তাদের প্রিয় নবীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে দূর থেকে তারা আবু জেহেলের দেখা পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে শত্রুসারি ভেদ করে তীর বেগে ছুটে গেলেন এবং আসমানী গজবের মতো আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারির এক আঘাতে মাটিতে ফেলে দিলেন। নবীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার এমনই মউজ ছিলো এমন কি মুসলিম কিশোরদেরও হৃদয়ে।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ আবু জেহেলকে মাটিতে পড়া অবস্থায় দেখতে পেয়ে কতল করে ফেললেন এবং ধড় থেকে ঘাড় বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এভাবে এক চরম অপমানজনক মৃত্যুর মাধ্যমে আবু জেহেল নরকবাসী হলো।

বদরের শোচনীয় পরাজয় থেকে মক্কার কোরেশরা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং নিজেরা শান্তিতে থাকবে, অন্যদেরও শান্তিতে থাকতে দেবে, এটাই ছিল কাম্য ও কর্তব্য। কিন্তু তা হলো না, উল্টো প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তাদের মাঝে। আবু সুফয়ান কাবাপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মূর্তির নামে শপথ করলো, বদরের নিহতদের প্রতিশোধ না নিয়ে সে স্ত্রী-সহবাস করবে না, গোসল করবে না, এমন কি মাথার চুলও ফেলবে না। তদুপরি সে নিহতদের স্মরণে 'বিলাপ ও শোক প্রকাশ' নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, যাতে প্রতিশোধস্পৃহা স্তিমিত না হয়।

এদিকে মুসলিমবাহিনী বিজয়ী বেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলো। কিন্তু তাদের মাঝে বিজয়ের কোন অহংকার ছিলো না, ছিলো শোকরের অপূর্ব বিনয়। কেননা তাদের যুদ্ধ ছিল সত্যের জন্য এবং তাদের বিজয় ছিলো সত্যের বিজয়। বস্তুত যুদ্ধজয়ের ইতিহাসেও আল্লাহর রাসূল বিশ্বমানবের সামনে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তাই বলি, হে 'সভ্য' পৃথিবী! ইসলামের জিহাদ ও যুদ্ধের সমালোচনা করো না; মুসলমানদের তলোয়ারকে নিন্দা করো না; বরং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন থেকে যুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করো। বিজয়ের মহত্ত্ব ও বিনয় শিক্ষা করো।

যুদ্ধের গনীমত বণ্টিত হয়েছিলো এভাবে যে, এক পঞ্চমাংশ রাসূলের তত্ত্বাবধানে বায়তুল মালে জমা করা হলো, যাতে প্রয়োজনের সময় এতীম, বিধবা ও অভাবীদের প্রতিপালনে এবং গণকল্যাণে ব্যয় করা যায়।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে হযরত ওমরের প্রস্তাব ছিলো মৃত্যুদণ্ড প্রদানের। কেননা এতে মুশরিকদের শক্তি খর্ব হবে এবং কোরেশের মাঝে ভীতি সৃষ্টি হবে। ফলে ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হবে। কিন্তু হযরত আবু বকর ও অন্যান্য ছাহাবার পরামর্শ মতে তাদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে শর্ত হলো এই যে, সচ্ছল বন্দীরা নির্ধারিত পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করবে, আর যারা লেখাপড়া জানে তারা মুসলিম শিশুদের লেখাপড়া শিক্ষা দান করবে। এটাই হবে তাদের মুক্তিপণ। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত ও অসচ্ছল বন্দীরা বিনাপণে মুক্তি লাভ করবে।

বস্তুত আল্লাহর নবীর জীবনের সব কিছুই নতুন, সব কিছুই শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির এমন আশ্চর্য সুন্দর ব্যবস্থা জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে ছিলো কল্পনাতীত। যুদ্ধবন্দীরা তাদেরই হাতে এক সময়ের নির্যাতিত মুসলমানদের এই মানবিক ও মহৎ আচরণে এতই মুগ্ধ হলো এবং কৃতজ্ঞতাপাশে এমনই আবদ্ধ হলো যে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

এছাড়া বন্দীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ অসাধারণ সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন। বন্দীদেরকে মদীনায় আনয়নকালে বাহন-স্বল্পতার কারণে নিজেরা পায়ে হেঁটে তাদের জন্য উটের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে মেহমানের মর্যাদায় রেখেছেন। এমনও হয়েছে যে, নিজেরা পানি ও খেজুর খেয়ে বন্দীদের ভালো খাবার দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করো, এই যদি হয় বন্দীদের সাথে ইসলামের আচরণ তাহলে সাধারণ অমুসলিমদের প্রতি তার আচরণ কেমন হতে পারে! সুতরাং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার করে এসো আমরা মুহাম্মদী শরীয়তের সৌন্দর্য অনুভব করি এবং তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করি।

***

বদরযুদ্ধের পর আবু সুফয়ান বিপর্যস্ত কোরেশ গোত্রের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন এবং উদাত্ত আহবান জানিয়ে বললেন, শোককে শক্তিতে পরিণত করো এবং আপন নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করো।

ফলে নতুন উদ্যমে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হলো। কিছুদিন পর আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল মদীনার আশেপাশে গোপন অভিযান চালিয়ে কতিপয় নিরস্ত্র মুসলমানকে হত্যা করলো, কিন্তু মুসলিমবাহিনীর ধাওয়া খেয়ে এমনই ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো যে, বোঝা হালকা করার জন্য ছাতুর বস্তাগুলো পথেই ফেলে গেলো।

এ ঝটিকা হামলার উদ্দেশ্য ছিলো কোরেশযোদ্ধাদের অন্তর থেকে বদরযুদ্ধের ভীতি ও আতংক দূর করা এবং মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। কিন্তু কোরেশহানাদারদের ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, বদরযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন এখনো তাদের তাড়া করছে।

***

বদরযুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের একটি রাজনৈতিক ফায়দা এই হলো যে, মদীনা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে এবং মুসলমানগণ একটি জাতি ও শক্তিরূপে আরবগোত্রগুলোর সামনে আত্মপ্রকাশ করলো। এই নতুন জাতি ও রাষ্ট্রের স্থপতি হলেন হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তখন তিনি আশপাশের বস্তি ও গোত্রগুলোকে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেলো। কোন কোন গোত্র ও বস্তি অবশ্য নিরপেক্ষ থাকার কথা বললো। এ কারণে তাদের উপর কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। কেননা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর নবী পূর্ণমাত্রায় ন্যায় ও ইনসাফ অনুসরণ করতেন। কিন্তু ইনসাফ ও উদারতার এই সুযোগে মদীনা ও মদীনার পার্শ্ববর্তী ইহুদী গোত্রগুলো চক্রান্তে মেতে উঠলো। বদরযুদ্ধে কোরেশের শোচনীয় পরাজয়ের পর মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তি ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট ছিলো অসহনীয়। কেননা এর মাঝে তারা একটি শক্তি হিসাবে নিজেদের

অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখতে পেলো। তাই ইসলামের শক্তি-শিকড়কে উপড়ে ফেলতে পর্দার আড়ালে তারা তৎপর হয়ে উঠলো।

কিন্তু হযরতের 'তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা' ছিলো মজবুত। তাই ষড়যন্ত্রের শাখাবিস্তারের পূর্বেই অবগত হয়ে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। চারশ পঞ্চাশজনের একটি দল নিয়ে ইহুদীবস্তিতে আল্লাহর নবী উপস্থিত হওয়ামাত্র তারা পাহাড়ী কেল্লায় আশ্রয় নিলো। মুসলমানগণ তখন আহারের আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন এবং আল্লাহর রাসূল একটু নিরালায় বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

এমন সময় এক ইহুদী তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভাবলো, সুবর্ণ সুযোগ! তাই সে অতি সন্তর্পণে পিছন থেকে এসে প্রিয় নবীর মাথার উপর তলোয়ার উঁচিয়ে বললো, মুহাম্মদ! কে তোমাকে বাঁচাবে আমার হাত থেকে?

এমন আচমকা বিপদের মুখেও আল্লাহর রাসূলের মাঝে কোন ভাবান্তর হলো না। তিনি চোখ মেলে তাকালেন এবং প্রশান্ত চিত্তে ও ভাবগম্ভীর কণ্ঠে শুধু বললেন, আল্লাহ।

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখে উচ্চারিত 'আল্লাহ' শব্দে এমন আসমানী জালাল ও প্রতাপ প্রকাশ পেলো যে, ইহুদীর শরীরে ভীষণ কম্পন শুরু হলো এবং তরবারি হস্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

প্রিয় নবী তখন তরবারি তুলে নিয়ে স্মিত মুখে ইহুদীর পানে তাকালেন। বললেন, এবার বলো, কে তোমাকে রক্ষা করবে?

মৃত্যুভয়ে ভীত ইহুদীর তখন করুণ অবস্থা। সে কোন রকমে শুধু বললো, তুমি ছাড়া কে আর বাঁচাবে!

প্রিয় নবী মৃদু হেসে স্নেহমাখা স্বরে বললেন, বলো সেই আল্লাহ বাঁচাবেন যিনি তাঁর রাসূলকে বাঁচিয়েছেন। বলো–

আশহাদু.... (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।)

***

এদিকে মক্কায় যখন যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো তখন তিন হাজার যোদ্ধার এক বিরাট বাহনী আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে যাত্রা করলো। মুসলিমবাহিনীর সংখ্যা প্রথমে ছিলো এক হাজার। কিন্তু মুনাফিকসরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাঈ এক অজুহাত খাড়া করে যুদ্ধ করবে না বলে ঘোষণা দিলো এবং তার তিনশ অনুচরসহ মাঝ পথ থেকে মদীনায় ফিরে গেলো। ফলে আল্লাহর রাসূল মাত্র সাতশ মুজাহিদের জামাত নিয়ে অগ্রসর হলেন।

ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো এবং ভোর হতে না হতেই প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেলো। 'জীবনের চেয়ে শহীদী মৃত্যু' যাদের কাছে অধিক প্রিয় সেই মুসলিমবাহিনীর শৌর্যবীর্য ও প্রবল প্রতাপের মুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই মুশরিকদের শিকড় উপড়ে গেলো এবং তারা বিশৃঙ্খলভাবে পিছু হটতে শুরু করলো। বিজয়ী মুসলিমবাহিনী তখন মালে গনীমত সংগ্রহে নেমে পড়লেন। পাহাড়ের গিরিপথ রক্ষার কাজে নিয়োজিত দলটিও তাতে যোগ দিলো আল্লাহর রাসূলের কঠোর নির্দেশ ভুলে গিয়ে।

সুযোগ সন্ধানী খালিদ বিন ওয়ালীদের চোখে এ ভয়ংকর ভুলটি ধরা পড়ে গেলো। তিনি কাল বিলম্ব না করে অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে পিছন থেকে হামলা করে বসলেন। এই আচমকা হামলায় মুসলমানগণ বিশৃঙ্খল ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ফলে দেখতে দেখতে যুদ্ধের নকশা পাল্‌টে গেলো। রাসূলের প্রিয় চাচা বীর হামযাসহ সত্তরজন ছাহাবী শহীদ হলেন, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর দান্দান শহীদ হলো, চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ঝরলো। যুদ্ধের পতাকা বহনকারী ছাহাবী শহীদ হওয়ার সাথে সাথে 'মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন' গুজব ছড়িয়ে পড়লো। কেননা তার ও নবীজীর মাঝে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিলো। এই ভয়ংকর গুজবে মুসলিমবাহিনী এমনই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো যে, একদল তো অস্ত্র ছেড়ে বসে পড়লো, আরেক দল জীবন দিতে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইত্যবসরে গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হলো এবং একদল ছাহাবী প্রিয়তম নবীকে দেখতে পেয়ে তাঁর পাশে জড়ো হলেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আল্লাহর রাসূলের একটি হুকুম অমান্য হওয়ার

সুযোগে প্রাপ্ত এতো বড় বিজয়ের পরও মুশরিকবাহিনী মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে, কিংবা মদীনা আক্রমণ করতে সাহস পেলো না; বরং আংশিক বিজয়কেই 'বড় পাওয়া' মনে করে মক্কায় ফিরে গেলো। এটা আল্লাহর মদদ ও কুদরত নয় তো কী?

কোরেশের স্ত্রীলোকেরাও ওহুদযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো। তারা বদরের নিহতদের স্মরণে শোক বিলাপ করে এবং মর্সিয়া গেয়ে যোদ্ধাদের উদ্দীপনা ও উন্মাদনা বহাল রেখেছিলো এবং কখনো উৎসাহ দিয়ে, কখনো ধিক্কার দিয়ে পলায়নোদ্যতদেরকে যুদ্ধের মাঠে স্থির রেখেছিলো। কিন্তু আবু সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দার অপরাধ ছিলো জঘন্যতম। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এ নারী শহীদ হামযার বুক চিরে কলজে চিবিয়েছিলো এবং কর্তিত নাক-কান গলায় ঝুলিয়ে নৃত্য-উল্লাস করেছিলো।

আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রিয় চাচার এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখে স্বভাবতই শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। ক্রোধেরও সঞ্চার হয়েছিলো তাঁর মাঝে। কিন্তু তিনি পূর্ণ সংযম প্রদর্শন করেছিলেন। শত্রুদের ফেলে যাওয়া লাশগুলোর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেননি।

***

মদীনায় মুসলমানদের ক্রমোত্থান অন্যান্য গোত্রকেও বিচলিত করলো। তদুপরি ওহুদযুদ্ধের ফলাফলে তাদের সাহসও বেড়ে গেলো। এই প্রেক্ষাপটে ইহুদীগোত্র বনী মুসতালিকের নেতা হারিছ মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো, কিন্তু মুসলিমবাহিনীর হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় হলো। দু'শ যুদ্ধবন্দী, এক হাজার উট ও পাঁচ হাজার দুম্বা গনীমতরূপে মুসলমানদের হস্তগত হলো। সরদারকন্যা জুওয়ায়রিয়া বন্দিনী হয়ে জনৈক ছাহাবীর মালিকানায় এলেন। প্রিয় নবী শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ সরদারকন্যার মুক্তির বিষয়টি চিন্তা করছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর আদেশই যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু তিনি ব্যক্তি-অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এবং নিজের পক্ষ হতে মুক্তিপণ আদায় করে সরদার কন্যাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্ব গোত্রে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে সরদার হারিছ যে কোন মূল্যে প্রিয় কন্যার মুক্তির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মদীনায় উপস্থিত হলেন এবং হযরতের মহত্ত্ব ও উদার আচরণের বিষয় অবহিত হলেন। কন্যার মুক্তি-সংবাদের আনন্দে তার পিতৃহৃদয় এমনই বিগলিত হলো এবং কৃতজ্ঞতার কোমল অনুভূতিতে তিনি এমনই অভিভূত হলেন যে, প্রিয় নবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শুধু 'অশ্রুর উপহার' নিবেদন করলেন। কৃজ্ঞতা প্রকাশের কোন শব্দ তিনি খুঁজে পেলেন না।

গোত্রপতি হারিছ অতঃপর আত্মীয় পরিজনসহ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রিয় নবীর খেদমতে নিবেদন করলেন যে, 'দাস-কন্যা'কে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন। সদ্যআলোকিত হৃদয়ের এ অনুপম ভক্তি ভালোবাসার কি জওয়াব দেবেন। প্রিয় নবী তা ভাবছিলেন, এমন সময় ছাহাবা কেরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানালেন যে, জুয়ায়রিয়া যদি উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদায় অভিষিক্তা হন তাহলে তার গোত্রের সকলকে আমরা মুক্ত করে দেবো। এটা কিভাবে হতে পারে যে, উম্মুল মুমিনীনের গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ আমাদের দাস-দাসী হয়ে থাকবে!

সুবহানাল্লাহ! এমনই সুগভীর ও অতলস্পর্শী ছিলো ছাহাবা কেরামের নবীভক্তি ও নবীপ্রেম।

***

'বিগত যুদ্ধগুলোর ফলাফল বিচার করে কোরেশ নেতা আবু সুফয়ান পরবর্তী যুদ্ধের জন্য আরো ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য গোত্রকেও জোটবদ্ধ করলেন। সবাইকে তিনি এ কথা বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, মুহাম্মদের উত্থান শুধু কোরেশের নয়, বরং সকল গোত্রের জন্যই বিপদের কারণ। ফলে এবারের যুদ্ধ একটি সর্বগোত্রীয় মাত্রা লাভ করলো।

ছয় হাজার ইহুদীসহ আঠারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে মদীনা আক্রমণে এগিয়ে আসছে শুনে প্রিয় নবী চিন্তিত হলেন এবং ছাহাবা কেরামের সঙ্গে জরুরী পরামর্শ করলেন এবং সময় ও পরিস্থিতি উপযোগী যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সকলের মতামত গ্রহণ করলেন। প্রিয় নবী কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ

পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করতেন না। আল-কোরআনেও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ছাহাবা কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর ভরসা করে অবিচল থাকার আদেশ করেছেন। বস্তুত শুরা ও পরামর্শ হলো মুহাম্মদী শরীয়তের অন্যতম স্তম্ভ।

সত্যের সন্ধানে পারস্য থেকে আগমনকারী সালমান ফারসী ছিলেন রাসূলের প্রিয় ছাহাবী। তিনি প্রস্তাব পেশ করে বললেন, উভয় পক্ষের শক্তির যে তারতম্য, তাতে শহরের বাইরে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়, বরং পরিখা খননপূর্বক শহরে অবস্থান করাই হবে যুক্তিযুক্ত। কেননা এতে হানাদার বাহিনী শহরে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। অন্যদিকে এত বিরাট বাহিনীর পক্ষে দীর্ঘদিন অবরোধ বহাল রাখাও সম্ভব হবে না।

সালমান ফারসীর প্রস্তাব প্রিয় নবীর খুবই মনঃপুত হলো এবং সন্তুষ্টচিত্তে তিনি তা অনুমোদন করলেন। স্বয়ং পরিখা খনন উদ্বোধন করে ছাহাবা কেরামের সাথে কাজে শরীক হলেন। অন্যান্যদের মতো তাঁরও পবিত্র হাতে কাজ করতে গিয়ে ফোসকা পড়েছিলো।

সময় ও পরিস্থিতি হিসাবে এ ছিলো এক কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু 'আল্লাহর নবী কাজ করবেন আর আমরা বসে থাকবো, এ তো গোমরাহি ছাড়া কিছু নয়' এরূপ অনুভূতির কারণে ছাহাবা কেরামের মাঝে এমন কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হলো যে, অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত গতিতে পরিখা খনন সম্পন্ন হয়ে গেলো। এ সময় ক্ষুধা ও অনাহারে ছাহাবা কেরামের এমন শোচনীয় অবস্থা হলো যে, তাঁদেরকে পেটে পাথর বেঁধে কাজ করতে হয়েছিলো। আল্লাহর নবীও পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। বস্তুত এটাই ছিলো তাঁর সারা জীবনের আদর্শ। মেহনত ও শ্রমের ক্ষেত্রে কারো থেকে তিনি পিছিয়ে থাকতেন না, বরং সকলের সাথে সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি জগতের সামনে এক অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। পরিখা দেখে আবু সুফয়ান হতবাক হয়ে গেলেন। কেননা এ ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরবদের জন্য ছিলো নতুন অভিজ্ঞতা। ফলে প্রথমেই শত্রুপক্ষের উদ্যমে ভাটা পড়লো এবং তাদের মনোবল দমে গেলো। শেষ ব্যবস্থা হিসাবে আবু সুফয়ান অবরোধ আরোপ করলেন। অন্যদিকে তিন

হাজার মুসলিম মুজাহিদ 'সিলা' নামক পাহাড়ের পাদদেশে পরিখার পিছনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন উভয় পক্ষে মামুলি তীরবিনিময় হলো। ব্যাপক যুদ্ধের কোন অবকাশ ছিলো না। কেননা পরিখা অতিক্রম করে হামলা চালানোর কোন উপায় ছিলো না হানাদার বাহিনীর।

অবরোধ দীর্ঘ হলে অবশ্য খাদ্যাভাবে মুসলমানদের অবস্থা সংকটজনক হতে পারতো। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহর মদদ নাযিল হলো। (জনৈক ছাহাবীর সফল গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে) আবু সুফয়ানের নেতৃত্বাধীন বহুগোত্রীয় বাহিনীতে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিভেদ দেখা দিলো। তদুপরি এক অন্ধকার রাত্রে এমন প্রবল ঝড় শুরু হলো যে, তাঁবু ও ছাউনীগুলো উড়ে গেলো। ফলে এমন চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, আবু সুফয়ানের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। তাই বাধ্য হয়ে তিনি 'পলায়ন গ্রহণ করার' নির্দেশ দিলেন। এভাবে মদীনার আকাশ থেকে এক ভয়ংকর বিপদের কালো মেঘ কেটে গেলো এবং প্রিয় নবী আল্লাহর শোকর আদায় করে ছাহাবা কেরামকে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন।

বস্তুত পরিখা-যুদ্ধই ছিলো ইসলাম ও কুফরের মাঝে মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধ। কেননা এ যুদ্ধে আরবের সম্মিলিত বাহিনী এক প্রকার বিনা যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলো। ফলে তাদের মনোবল এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলো যে, আক্রমণের অবস্থানে ফিরে আসা তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এখন থেকে আমরা আক্রমণে যাবো, আমরা অভিযান করবো। ওরা আর আক্রমণে আসতে পারবে না। বলাবাহুল্য যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো।

***

একে একে কয়েক বছর কেটে গেলো। মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহর ঘর যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বিদ্যমান ছিলো এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছিলো। আল্লাহর ঘর যেন প্রতিনিয়ত তাদের হাতছানি দিয়ে

ডাকছিলো। আল্লাহর দরবারে তাদের আত্মার আকুতি যেন ছিলো এই–

হে দয়াল রহমান! তোমার দুশমন যারা তারা হলো তোমার ঘরের পড়শী। আর আমরা যারা তোমাকে এক বলে মানি এবং তোমাকেই শুধু সিজদা করি তাদের জন্য তোমার ঘরের তাওয়াফ হলো নিষিদ্ধ। কিন্তু আর কতকাল হে মাওলা রাহীম! এবার তো আমাদের ডেকে নাও তোমার ঘরের ছায়ায়, তাওয়াফ করে প্রাণ-মন যাতে জুড়ায়!

অবশেষে আল্লাহর দরবারে কবুল হলো তাদের আহাজারি ও ফরিয়াদ, তাদের দীর্ঘদিনের কান্না ও অশ্রুপাত। আল্লাহর ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবী রওয়ানা হলেন মক্কার পথে। তাঁর অনুগামী হলো পনেরশ ছাহাবার এক কাফেলা। কোরবানীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উটও সাথে নেয়া হলো। কাফেলা ছিলো নিরস্ত্র। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো বায়তুল্লাহর যেয়ারত, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু সব কিছু জেনে বুঝেও মক্কার কোরেশ নবী ও তাঁর অনুগামী কাফেলাকে মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর হলো।

মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে হোদায়বিয়ায় উপনীত হয়ে প্রিয় নবী কোরেশের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং দূত মারফত পয়গাম পাঠালেন যে, আল্লাহর ঘর যিয়ারত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এ জন্যই আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছি। সুতরাং আশা করি, আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী হিসাবে তোমরা আমাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবে।

কিন্তু নরম কথায় নরম যদি হবে কোরেশের মন তাহলে এতদিন এতো জুলুম্ নির্যাতন কেন হবে! এতো যুদ্ধ ও রক্তপাতই বা কেন ঘটবে! তাদের মূর্খতার তখন এমন চূড়ান্ত হলো যে, আল্লাহর রাসূলের মর্মস্পর্শী আবেদনেও তাদের মন ভিজল না, হৃদয় কোমল হলো না! বরং সন্ধির নামে তারা এই সকল অপমানজনক শর্ত মেনে নিতে চাপ দিলো–

১. এবার হোদায়বিয়া থেকেই ফিরে যেতে হবে মুসলমানদের। অবশ্য ইচ্ছা করলে আগামী বছর তারা আসতে পারে।

২. তখন তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করা যাবে না এবং খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না।

৩. মক্কা থেকে কেউ মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। পক্ষান্তরে মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে এলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

৪. এক পক্ষ অপর পক্ষের কোন মিত্র গোত্রের উপর চড়াও হবে না।

৫. এ সন্ধির মেয়াদ হবে দশ বছর।

ছাহাবা কেরাম এ ধরনের অপমানজনক সন্ধির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের কথা, কোরেশ যদি ইনসাফ ও শান্তির ভাষা না বোঝে তাহলে তরবারির ভাষায় ফায়সালা হোক।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল তো দুনিয়াতে এসেছেন শান্তি ও রহমত রূপে। এমনকি তাঁর যুদ্ধও শান্তির জন্য নিবেদিত। তাঁর তলোয়ারও রহমতের জন্য উত্তোলিত। কোরেশ যত অবুঝ হোক তিনি তো তাদেরও কল্যাণকামী! কোরেশ যত উন্মাদ হোক তিনি তো তাদেরও পথ-দিশারী! সুতরাং শান্তি ও সন্ধির জন্য কোরেশ যতটা দাবী করছে তিনি তো তার চেয়ে বহুদূর যেতে রাজী! তাই কোরেশ বারবার যে পবিত্র হাতকে অসম্মান করেছে সে হাত তিনি তরবারি ধারণ না করে সন্ধির জন্য বাড়িয়ে দিলেন।

ওরে নির্বোধ, এখনো সুযোগ আছে; পরম সমাদরে এই নূরানী হাত ধরে আলোর পথে আয়! সত্যের পথে আয়!

শান্তি ও সন্ধির প্রতি প্রিয় নবীর আকুতি দেখে ছাহাবাগণ অম্লান বদনে ও অবনত মস্তকে তা মেনে নিলেন। আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাঁদের নীতি ও আচরণ তো ছিলো এই–

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ করেন তাহলে আমরা তাই করবো।'

মোটকথা, কোরেশের আরোপিত শর্ত মোতাবেক সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হলো এবং মুসলমানগণ বায়তুল্লাহ যিয়ারতের বাসনা অপূর্ণ রেখে হোদায়বিয়া থেকেই মদীনায় ফিরে এলেন।

বস্তুতঃ হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি বাহ্যত বশ্যতামূলক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সব দিক থেকেই মুসলমানদের জন্য তা লাভজনক ছিলো। এ

কারণেই আল-কোরআনে এ সন্ধিকে ফাতহে মুবীন বা স্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। সন্ধির শর্তগুলো বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথমতঃ বায়তুল্লাহর যিয়ারত একবছর আগে বা পরে হওয়াতে কিছুই আসে যায় না। তদ্রূপ মক্কায় তিন দিনের কম বেশী অবস্থান করা তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো বায়তুল্লাহর যিয়ারত। আর প্রথমবার শর্তারোপ ছাড়াই যখন নিরস্ত্র অবস্থায় আসা হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বার নিরস্ত্র অবস্থায় আসতে আপত্তি কোথায়!

চতুর্থ শর্তটি সবচে' অপমানকর মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ না করুন ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে কেউ যদি মক্কায় চলে যায় তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার কোন প্রয়োজনই মুসলমানদের নেই। পক্ষান্তরে যিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় নিবেন তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর পর অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য কোন না কোন পথ খুলে দেবেন। পরবর্তীতে তাই হয়েছিলো। সর্বোপরি দশ বছর মেয়াদের সন্ধি ও শান্তির সুযোগে ইসলামপ্রচারের যে অবকাশ পাওয়া যাবে অন্য অবস্থায় তা পাওয়া যাবে না।

***

হেজাযভূমিতে ইসলাম যখন একটি শক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, তদুপরি সন্ধি চুক্তিরমাধ্যমে মুসলমানদের অস্তিত্ব যখন নিরাপদ হয়ে গেলো, আল্লাহর নবী তখন হেজাযের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলেও ইসলামের দাওয়াত প্রচারের আয়োজন করলেন। কেননা তিনি তো শুধু আরবের নবী নন, বিশ্ব-নবী। সমগ্র মানবতার জন্য আল্লাহর রহমতরূপে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তাই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বাদশাহ ও শাসকবর্গের নামে তিনি দাওয়াতপত্র প্রেরণ করলেন। 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত পত্র বহন করে দূতগণ আবিসিনিয়া, ইরান, রোম, সিরিয়া ও মিসরের শাসকবর্গের দরবারে উপস্থিত হলেন। পত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু ছিলো অতি সুস্পষ্ট ও সৎসাহসপূর্ণ, যা নবী ও রাসূলের শানের পূর্ণ উপযুক্ত। নমুনা দেখুন–

'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ-এর পক্ষ হতে অমুক দেশের শাসক বা সম্রাটের নামে–

আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা। আমি আপনাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনুন এবং আমাকে তাঁর প্রেরিত রাসূল রূপে বিশ্বাস করুন এবং পরকালের অফুরন্ত সুখ ও নেয়ামত ভোগ করুন।'

আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী তো রাসূল ও রিসালাতের পরিচয় পূর্বেই লাভ করেছিলেন, এবার দাওয়াতপত্র লাভ করে তিনি ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন। রোম-সম্রাট পত্র ও পত্রবাহককে যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করলেন। তবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েও সভাসদবর্গের বিক্ষোভের মুখে পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু পারস্য-সম্রাট চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক পত্র ছিঁড়ে ফেললো এবং পত্রবাহককে হত্যা করলো। আল্লাহর পক্ষ হতে এর শাস্তিরূপে অল্প কিছু দিন পরেই সে নিহত হলো এবং তার রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

***

জাতিগতভাবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত যাদের মজ্জাগত সেই ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় মেতে উঠলো গোপন চক্রান্তে। এমন কি মুসলমানগণ তাদের সামরিক প্রস্তুতির বিন্দুবিসর্গও আঁচ করতে পারেনি। মক্কায় কোরেশসরদারদের সাথেও তাদের যোগসাজেশ ছিলো। মদীনার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার একটা পরিকল্পনা প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু বরাবরের মত এবারও অভিশপ্ত ইহুদীদের কপাল মন্দ হলো। শেষ মুহূর্তের কিছু পূর্বে আল্লাহর রহমতে তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলো এবং আল্লাহর রাসূল অসাধারণ সামরিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ইহুদীদুর্গগুলোর উপর তড়িৎ হামলা চালালেন। একে একে সব ক'টি দুর্গের পতন হলো। অবশিষ্ট ছিলো শুধু ইহুদীদের শক্তির মূল কেন্দ্র খায়বার দুর্গ। পর্যাপ্ত রসদসহ দীর্ঘ অবরোধবাসের প্রস্তুতি নিয়ে ইহুদীরা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলো। মুসলিমবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিলো অবিলম্বে সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা। কিন্তু ইহুদীপক্ষ কোন মূল্যেই দুর্গ

থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি ছিলো না। কেননা তাদের ধারণা ছিলো যে, অবরোধ একটু দীর্ঘ হলেই মুসলিমবাহিনীর অবস্থা ও অবস্থান নাযুক হয়ে পড়বে। ফলে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হবে। তাই বিচ্ছিন্ন কিছু সংঘর্ষের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলো তাদের যুদ্ধতৎপরতা।

চোখের অসুস্থতায় হযরত আলী তখন অস্ত্রধারণ করার মত অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, আগামীকাল যুদ্ধের পতাকা আমি এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবো, আল্লাহর ইচ্ছায় যিনি খায়বার দুর্গ জয় করবেন।

হযরত ওমর ও অন্যান্য ছাহাবা আশায় আশায় রাত ভোর করলেন যে, হয়ত তাঁর কিসমতেই জোটবে এ মহাসৌভাগ্য। কিন্তু আবু বকর নন, ওমর কিংবা ওছমানও নন, এ পরম সৌভাগ্য লাভ করলেন সেই তিনি, হিজরতের রাতে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নবীর শয্যায় শুয়েছিলেন যিনি। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকের ইচ্ছা, প্রত্যেকের চেষ্টা, প্রিয় নবীর কৃপাদৃষ্টি তাকে যেন ধন্য করে। কিন্তু আল্লাহর নবী একে একে সবাইকে দেখে বললেন, আমার আলী কোথায়?

হযরত আলী সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং চোখের অসুস্থতার কথা জানালেন। প্রিয় নবী কেমন এক মায়াভরা চোখে তাকালেন চাচা আবু তালিবের পুত্র আলীর দিকে। তিনি অভিভূত হলেন, কৃতার্থ হলেন এবং অপার্থিব এমন এক শক্তি অনুভব করলেন যে, মনে হলো, বিশ্বজয় করাও তাঁর অসাধ্য নয়। আল্লাহর রাসূল তাঁর মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দিলেন আলীর চোখে। ফলে অসুস্থতা দূর হলো এবং এমন ভাবে দূর হলো যে, জীবনে আর কখনো তাঁর চোখে কোন কষ্ট হয়নি। তিনি দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন আল্লাহর রাসূলের সামনে। আর তিনি তার হাতে অর্পণ করলেন যুদ্ধের পতাকা। আলী তখন আল্লাহু আকবার বলে তরবারি হাতে বীর দর্পে এগিয়ে গেলেন খায়বারদুর্গের দিকে। দুর্গ-দ্বারে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। দুর্গ-রক্ষক মুরাহ্হাবের ভাই বেরিয়ে এসেই আচমকা হামলা করে বসলো এবং একের পর এক আক্রমণ শানাতে লাগলো, আর হযরত আলী আত্মরক্ষামূলক তলোয়ার চালিয়ে গেলেন। কিন্তু যখন তিনি আক্রমণে এলেন তখন বেচারার বড় করুণ